প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

# সূচী।

# বিরামকুঞ্জ

## কর্ম্মফল

( ১ )

বাল্যেই আমার মাতৃবিয়োগ হয়। আমার পিতা দরিদ্র ছিলেন। আমার সেবার জন্য যে একজন দাসী নিযুক্ত করেন, এমন ক্ষমতা তাঁহার ছিলনা। গৃহে অপর আত্মীয়ারও অভাব। বাধ্য হইয়া তাঁহাকেই আমার পালনের ভার লইতে হয়।

তবে তাঁহার পালনটা আমার পক্ষে বড় প্রীতিকর হইল না। প্রকৃতির একটু অস্বাভাবিক উগ্রতা, তাঁহার অন্য সমস্ত গুণকে নিমজ্জিত করিয়াছিল। আমরা ভাল কুলীন—ফুলে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। সমস্ত গ্রামের মধ্যে আমাদের সমকক্ষ কুলীন কেহ ছিল না। পিতার এই কৌলিন্যগর্ব্ব অবস্থাহীনতার সহিত মিশিয়া এমনই বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছিল যে, গ্রামের মধ্যে কেহই

তাঁহাকে প্রীতিচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পারিত না! বংশমর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়া, পিতাও গ্রামস্থ সকলকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এমন কি গ্রামের জমীদার দেশহিতৈষী বদান্য রায় বাহাদুর রাধাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীও তাঁহার নিকটে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। জমীদার বাবুর অপরাধ, তিনি একদিন কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক গললগ্নীকৃতবাসে আহূত, আনীত, ও বহুমানে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত, রামধন মুখোপাধ্যায়ের এই প্রপৌত্রকে লোকদিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন —নিজে আসিতে পারেন নাই। গ্রামবাসীর অপরাধ, তাহারা সেই শিবহীন যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল।

অবশ্য কাহার কি দোষ, আমার বুঝিবার তখন শক্তি ছিল না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশে এখন এত শীঘ্র শীঘ্র সামাজিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে যে, পিতার কৌলীন্যগর্ব্ব সে সময়েও যে লোকের পক্ষে অসহনীয় হইয়াছিল, ইহা বিচিত্র নয়।

ফলে কিন্তু একা আমাকে, সেই অল্পবয়সেই, নিঃসঙ্গ উগ্র-প্রকৃতিক পিতার সমস্ত ক্রোধের ভার বহন করিয়া বহুদিন যাপন করিতে হইয়াছে। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মায়ের মমতায় পুষ্ট হইয়াছিলাম, এখন পিতৃতাড়নায় তাহা হৃদয়ের অন্তস্তম কক্ষে

লুক্কায়িত ও ঘনীভূত হইয়া, নিষ্পীড়নে আমাকে দিন দিন ক্ষীণ করিতে লাগিল। এমন পিতার যে মমতা থাকিতে পারে, ইহা আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিতে পারি নাই।

( ২ )

আমাদের গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ভৈরব নদ বহিয়া যাইত। মা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভৈরবে স্নান করিতে যাইতাম। আমার বেশ মনে পড়ে, মা যখন জলে নামিতেন, তখন আমি তীরে বসিয়া, পরপারের খেজুর বনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতাম। নিদাঘে তাহাদের পীতাভ হরিদ্বর্ণের মাথাগুলা যখন ভৈরবের স্বচ্ছজলে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন মনে করিতাম বুঝি, তাহারাও স্নান করিতে জলে নামিয়াছে। সেই ছায়াগুলার অবিরাম কম্পন, জলকেলি মনে করিয়া, তাহাদের সঙ্গে খেলিবার আগ্রহে অন্যমনস্কে জলে নামিতাম। পৃষ্ঠদেশে মাতৃপ্রদত্ত চপেটাঘাত-ঔষধে যখন শৈশব কল্পনা দূরে পলাইত, তখন জননীর অঞ্চলের সহিত কলহ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতাম। এখন সে ভৈরবও নাই আমারও সে মা নাই—সুতরাং ভৈরবতীরে বসিয়া, তাহার গভীর জলাভ্যন্তরে সেই

মায়িক উদ্যানের অনুসন্ধানে জলালোড়নেরও উপায় নাই। কয়েক বৎসর হইতে ভৈরবের মোহানা বন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ছোট ছোট নৌকাগুলি মাথায় লইয়া সেই স্বচ্ছ শুভ্র-সলিলপ্রবাহ উভয়তীরের শ্যামতরুচ্ছায়াকীর্ণ গ্রামগুলির মধ্য দিয়া, এখন আর গ্রামবধূর মেখলার ন্যায় পড়িয়া থাকে না। এখন ভৈরব শৈবাল সমাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে শুষ্ক। সেখানে প্রতিসন্ধ্যায় একবার করিয়া যাই বটে, কিন্তু শৈবালাচ্ছন্ন নদে আর অবগাহন করিতে সাহস করি না। পিতার পানার্থ কেবল এক কলসী জল লইয়া চলিয়া আসি।

( ৩ )

ক্রমে জল পঙ্কিল দুর্গন্ধময় কীটবহুল—সর্ব্বতোভাবে অপেয় হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে, এক সময়ের স্বাস্থ্যকর স্থান ম্যালেরিয়া, কলেরার আবাসভূমি হইল। 'দলে দলে লোক মরিতে লাগিল। চিতানির্ব্বাপনের জল যোগাইতে ভৈরব বিশীর্ণ ও মলিন হইয়া গেল। বিজ্ঞগণ বুঝিলেন, এরূপভাবে লোকক্ষয় হইলে, দুই চারি বৎসরের মধ্যেই গ্রাম জনশূন্য হইবে। রাধাপ্রসাদ বাবু এই বিষম বিপদে লোকরক্ষার জন্য একটী বৃহৎ জলাশয় খনন করাইলেন।

লোকে তাহার জলমাত্র ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইল। পানীয় জলের বিশুদ্ধি রক্ষার্থ রাধাপ্রসাদ বাবু আদেশ দিলেন যে, কেহ তাহাতে স্নানাদি কার্য্য করিতে পারিবে না। গ্রামবাসী সেই জলে বহু উপকার পাইল।

আমার ভাগ্যে কিন্তু সে জল লওয়া ঘটিয়া উঠিল না। সে সরোবরতীরে যাইতে পিতার নিষেধ ছিল। কাজেই, গ্রামের মধ্যে আমি একাই ভৈরবের দুঃসময়ের সঙ্গী—প্রতি সন্ধ্যায় কলসীমুখ-প্রেরিত তাহার দুই চারিটা ধন্যবাদ শুনিতে অবশিষ্ট রহিলাম।

কিন্তু এরূপ করিয়া কয়দিন যাইব? গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতার ব্যবহৃত, সেই সুপেয়সলিলের আধার পশ্চাতে রাখিয়া, একাকী সেই দূরস্থ ভৈরবের নিকট যাইতে আমার মন সরিত না। বিশেষতঃ প্রতিদিন এক সময়ে আমি সেখানে যাইতে পারিতাম না। কোন কোন দিন পৌছিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। সেদিন মৃত্যুচ্ছায়াসমাকীর্ণ, অনতিদূরের, ক্ষুধিতচিতাভূমি জলশূন্য কলসী-গুলার অন্ধকারময় কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুদিয়া আমার পানে যেন চাহিয়া থাকিত। আমি জল লইতে লইতে হস্তস্থিত কলসীমুখের শব্দে শিহরিয়া উঠিতাম।

( ৪ )

একদিন বৃহস্পতিবার। পিতার আদেশে বারবেলা অতিক্রম করিয়া, ভরাসন্ধ্যায় আমি জল আনিতে চলিয়াছি। পিতা একটু বেলা থাকিতে আমাকে এই নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ পথে একটু খেলা করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছিলাম। তার ফলে এই শাস্তি।

ভীতিভরাবসন্নদেহে চলিতে চলিতে আমি বড়ালদের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় রামরূপ বড়ালের মেয়ে ভাগীরথী, কোথা হইতে আসিয়া আমার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, তাহারও কাঁকে একটী ছোট কলসী।

ভাগীরথী জিজ্ঞাসা করিল—"বাণীকণ্ঠ দাদা! কোথায় চলেছ?" এরূপ প্রশ্ন করা ভাগীরথীর সর্ব্বতোভাবেই অবিধেয় হইয়াছিল। আমার কাঁধের কলসী, এই সন্ধ্যার আধা অন্ধকারেই সে যদি দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার অতবড় দুইটা উজ্জ্বল চক্ষু থাকিয়া লাভ কি হইল! আর কলসী দেখিয়াও, বৃথাপ্রশ্নে পথ আগুলিয়া সে যদি আমার সময় নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার উপর ক্রোধ হইলে, কেহই তাহাতে ন্যায়সঙ্গত আপত্তি করিতে পারেন না।

নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়, দশ এগার বৎসর বয়স হইতে চলিল, এই এতকাল তাহাদের বাড়ীর সুমুখদিয়া যাতায়াত করিতেছি, সেওত প্রায়ই দেখিতেছে, তাহার যে বুদ্ধি নাই, তাই বা কেমন করিয়া বলিব!

মনে মনে আমার বড়ই রাগ হইল। মনে করিলাম বলি— "চুলোয় চলেছি—সঙ্গে যাবে ?"

কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার শুদ্ধমাত্র ক্রোধটা আয়ত্ত করিয়া, আমিও কি পিতার ন্যায় লোকের অপ্রিয় হইব! তাই আত্মসংযত হইয়া বলিলাম—"কোথায় যাইতেছি, তুমি কি জান না ?"

ভাগীরথী ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"জানি। সেই জন্যই এসেছি। তুমি এই অন্ধকারে জল আন্‌তে চলেছ দেখ্‌তে পেয়ে, মা আমাকে দিয়ে তোমায় নিষেধ করতে পাঠিয়েছেন।"

"তার পর ?"

"আমি তোমার হয়ে জল আনি। সেই জন্য কলসী এনেছি।"

"কোথাথেকে আন্‌বে ?"

"যেখান থেকে বল। তোমার অতবড় কলসী আমি

তুলতে পারবো না। বল, আমার কলসী দিয়ে দুইবারে এনেদি।"

"আমি যদি ভৈরবতীরে এসময় যাবার যোগ্য নই, তুমি যাবে কেমন করে?"

"কেন বাবুদের পুকুর থেকে জল আন্‌তে দোষ কি? তোমাকেত যেতে হবে না। তুমি পথে দাঁড়িয়ে থেকো।"

কি জানি কোন্ নীতিশাস্ত্রোপদেশে আমিও বুঝিলাম "দোষ কি?"

আমি ভাগীরথীর সঙ্গে চলিলাম।

( ৫ )

যাহারা জল লইবার, তাহারা সকলেই লইয়া গিয়াছিল। বাবুদের ঘাট নির্জন, পথও নির্জন। আমি কেবল পথে একা দাঁড়াইয়া। ভাগীরথী আধ কলসী জল দিয়া গিয়াছে, আমি আর আধ কলসীর প্রতীক্ষা করিতেছি। যে সিপাই পুকুরটা পাহারা দেয়—সে পুকুরের পাড়ের পর্ণকুটীরে বসিয়া, একটা ঢোল লইয়া, চক্ষু মুদিয়া, বাদ্যের তালে বেতালে, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে—

"রামচঁদরপদ ভজত মূরত কাহে জাগিয়া বাঁশরি।
আখিকা গুরি, গুরিকা চেনি, চেনিকা মিছুরি বনাই দিয়ারে
রামা-আ-আ"—

গান ধরিয়াছে। আমি বাধ্য হইয়া এই জলজ বৈতালিকের অলক্ষ্যে তৎপ্রেরিত "রামার" সৃষ্ট এই মিছুরির চোটা কর্ণাধঃকরণ করিতেছি।

ভাগীরথী দ্বিতীয়বার ফিরিতে বড়ই বিলম্ব করিল। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে সরোবরতীরে যাইতে হইল। গিয়া দেখি, বালিকা সরোবর সোপানে অধোমুখী, পায়ের উপর পা রাখিয়া—অর্দ্ধধৌত অলক্তকরাগে বারংবার অঞ্জলি পূর্ণ জলনিষেক করিতেছে। বুঝিলাম, আমার জন্যই আজ বালিকার পায়ের আল্‌তা ধুইয়া গেল।

কিন্তু রাত্রি হইতে চলিল, আর তাহার অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলেও ত চলিবে না! তাই ডাকিলাম—ভাগীরথী!"

ভাগীরথী সুপ্তোত্থিতার ন্যায় একবার চমকিয়া আমার পানে চাহিল। তার পর অনাধরসম্বদ্ধ হাস্যে আমাকে বলিল—"কেমন এনেছি ত?"

বালিকার দুষ্টামি বুঝিয়া আমি অপ্রতিভ হইলাম। একটা

অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোতও সেই সঙ্গে আমার হৃদয়প্রদেশ দিয়া সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হইয়া গেল। আমি বলিলাম,—"তাতো আনলে, কিন্তু কলসী ?" বিস্মিতা বালিকা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, কলসী মাঝ সরোবরে ভাসিতেছে।

"তাহলে কি হবে ?"

"কি আর হবে, আমি জলে নামিব।"

"এ জলে যে কাউকে নামিতে দেয় না !"

"এখন আর কে দেখিতে আসিতেছে ?"

আমি জলে নামিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীর গানবাদ্য বন্ধ হইয়া গেল। নিঃশব্দে সাঁতারিয়া কলসী ধরিলাম। ফিরিয়া দেখি, ভাগীরথী নাই। সর্ব্বোচ্চ সোপান মঞ্চে আরোহণ করিয়া চারিদিক চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"ভাগীরথী !"

মঞ্চপার্শ্বস্থ বেদীর অন্তরাল হইতে সিপাহী বাহির হইয়া, দেখিতে দেখিতে আমার কাণ ধরিল। আর অতি রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"ভাগীরথী মেরা পাশ্ হ্যায়।"

সবলে সে আমার কাণ আকর্ষণ করিয়া, কুটীরাভিমুখে লইয়া চলিল। অপমানে, কর্ণবেদনায় আমার চক্ষে জল ছুটিল।

আমাকে যাঁহার সম্মুখে লইয়া গেল, তিনি রাধাপ্রসাদ বাবুর

একমাত্র পুত্র মাধব বাবু। নিকটে উপস্থিত করিবামাত্র, তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন—'এপুকুরে কাহারও নামিবার হুকুম নেই, তা জান?"

তখন সিপাহী কাণ ধরিয়াছিল। আমি মাথা তুলিয়া কথা কহিবার সুবিধা পাইলাম না। মাথা হেঁট করিয়াই বলিলাম—"আমি আর কখনও আসি নাই।"

"তবে কি নিমিত্ত কুলীনপুত্রের, সহসা আজ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হইল?" আমি আর উত্তর দিলাম না। তিনি দয়া করিয়া, সিপাহীকে দিয়া আমার কাণ মলিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

আঘাতের উপর আঘাতে আমার মর্ম্মটি যেন পিশিয়া গেল।

সিপাহী, প্রভুর আদেশে আমার হাত হইতে কলসীটা কাড়িয়া ভাগীরথীদের দিতে গেল।

আমি একবারমাত্র বলিলাম—"আপনি নিজে আমাকে শাস্তি দিলেন না কেন? একটা নীচ ভৃত্য আমার অপমান করিল?"

বাবু উত্তর দিল—"কি করিব—তোমার কর্ম্মফল।"

আমি আমার অর্দ্ধপূর্ণ কলসীটা এক হস্তে লইয়া, অপর হস্তে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিলাম।

( ৬ )

পিতা তখন সায়ংসন্ধ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। নহিলে সিক্ত বস্ত্রে ফিরিতে দেখিলে, তখনই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। সদুত্তর দিতে কি আমার সাহস হইত! আমি অবকাশ পাইয়া তাঁহার অলক্ষ্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম। তৎপরে একটা প্রদীপ লইয়া দাওয়ায় বসিয়া একখানা পুঁথি খুলিয়া নীরবে পড়িতে লাগিলাম। পিতার কাছে তিরস্কৃত হইবার ভয়ে, আমি মাধববাবু কৃত অপমান ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু শত-চেষ্টায়ও হৃদয়ের একটা দুর্দ্দম আবেগ আমার দীর্ঘ নিশ্বাস কম্পিত করিয়া বাহির হইতেছিল।

সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া পিতা গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, আমি পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন—"বেশ, শাস্ত্রকে সহচর কর। তাহা হইলে তোমাকে আর ইহজীবনে সঙ্গীর অভাব অনুভব করিতে হইবে না।" এই বলিয়া একটী শ্লোক আওড়াইলেন—

অনেক সংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

প্রতিদিন এই সময়ে, আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করি। আজ আর তাহা করিতে হইল না। তিনি নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিতে আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে আমি পুঁথিখানা দেখিয়া লইলাম—হিতোপদেশ।

একটা শ্লোকে চক্ষুস্থাপিত করিলাম। দেখিলাম—"অনেক সংশয়চ্ছেদি—"ইত্যাদি। পিতা কি অন্তর্য্যামী! কি জানি কেন হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল!

সহসা গৃহমধ্য হইতে প্রশ্ন উঠিল—"জল আজ এত কম হইল কেন?" আমি উত্তর দিলাম না—নীরবে মধুসূদন স্মরণ করিলাম।

মুহূর্ত্ত পরেই পিতা রুদ্রমূর্ত্তিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অতি রুক্ষস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জল কোথা হইতে আনিলি?"

ভয়কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম—"ভৈরব—"

"মিথ্যাবাদী! আমার সমস্ত শাস্ত্র-শিক্ষা পণ্ড করিতেছ! ভৈরব হইলে তাঁহার চরণামৃতের পবিত্র গন্ধ অনুভব করিতেছি না কেন?" বলিয়াই প্রহার করিবার জন্য সবলে সেই প্রহরিধৃত কর্ণ-টীকেই আকৃষ্ট করিলেন। ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর, তিনি

আর আমার প্রতি এরূপ অসদাচরণ করেন নাই। দোষ দেখিলে, মুখেই তিরস্কার করিতেন।

কর্ণে পূর্ব্বেই যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিতেছিলাম, পিতার কঠোর আকর্ষণে তাহা অসহ্য হইয়া পড়িল। আমি তাঁহার পদধারণ করিয়া বলিলাম—"ক্ষমা করুন—আমি বলিতেছি।"

কর্ণ হইতে হস্ত লইয়াই পিতা বলিলেন—"তোর কি কাণে ঘা ছিল?" মাথা তুলিয়া দেখি তাঁহার অঙ্গুলি রুধিরে রঞ্জিত।

সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলাম।

একটিমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পিতা বলিলেন—"মাধব ঠিক বলিয়াছে—তোমার কর্ম্মফল।"

( ৭ )

কর্ণবেদনায় সারারাত্রি আমার ঘুম হইল না। তথাপি সে দিন আমার কি সুখের দিন! আমার উগ্র-প্রকৃতিক পিতার প্রাণে এত মমতা! সারা রাত্রি আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তিনি আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। শুশ্রূষারত শীতল করের ক্ষণেক অপসারণে এক ফোঁটা উষ্ণ জল আমার গণ্ডে পতিত হইল। আমি বুঝিলাম পিতা রোদন করিতেছেন। মরুভূমি

রীতিমত খনিত হইলে, তাহা হইতেও উৎস উৎসারিত হয়, প্রেমপ্লাবিনী-প্রস্রবিনী পাথরের হৃদয় ভেদ করিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে।

বেদনায় আমি বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিলাম, আনন্দের আকস্মিক আবেগে, ভরা গাঙ্গে যেন বান ডাকিল। বহুদিন হইতে লুক্কায়িত অমৃতভাণ্ড হাতে পাইয়া উদর পূর্ণ করিয়া পিপাসা মিটাইতে আমার সাহস হইল না।

বলিলাম—"আপনি নিদ্রা যান্।"

অশ্রুগদগদকণ্ঠে পিতা বলিলেন—"নিদ্রা!—বাণীকণ্ঠ! মাধব তোমার কর্ণে আঘাত করে নাই, সে আমার কর্ণমর্দ্দিত করিয়াছে। আমি বেদনা অনুভব করিতেছি। কিন্তু ইহা আমারও কৰ্ম্মফল। দরিদ্র—আপনারই উদরান্ন সংগ্রহে অসমর্থ—আমার সংসারী হইতে এত সাধ হইয়াছিল কেন? সংসার করিলাম, কিন্তু রাখিতেই বা পারিলাম কই?"

"আমার কর্ণে আর বেদনা নাই।"

"তোমার না থাকিতে পারে; কিন্তু আমার আছে। তীব্র জ্বালায় জ্বলিতেছে। যতদিন ইহার ঔষধ না পাইব, ততদিন উত্তরোত্তর বাড়িবে।" কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিবার

চেষ্টায়, সমস্ত রাত্রির অনিদ্রামথিত চক্ষে, নানা জাতীয় স্বপ্ন আসিয়া, আমাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিল। আমি দেখিলাম—পিতা একটা অত্যুচ্চ অচলের শিখরে উঠিয়া, কি ভীষণ অন্ধকার-ময় গৃহমাঝে, কোন্ যক্ষ কর্ত্তৃক কত কাল হইতে রক্ষিত রত্ন-ভাণ্ডারের অন্বেষণ করিতেছেন। তীব্র দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া অচলের বজ্র-কঠোর বক্ষও কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। সেই কম্পিত-হৃদয়চ্যুত রত্নধারা একটী স্নিগ্ধ সলিলরূপিণী স্রোতস্বিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া প্রবল তরঙ্গে অচল পাদমূলে চলিয়া, গ্রাম নগর দেশ ভাসাইয়া, আমার কুটীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। কি জানি কি অপূর্ব্ব আনন্দে আমি স্রোতের জলে গা ঢালিতে গৃহ ত্যাগ করিলাম। বাহিরে যাইয়া দেখি, কোথায় স্রোতস্বিনী? মধুর কলতরঙ্গ কণ্ঠে নিবিষ্ট করিয়া গৃহ পার্শ্বস্থ কুঞ্জ হইতে কে যেন বলিল—"কেমন এনেছিত"! চাহিয়া দেখিলাম ভাগীরথী।

মনের অতি আবেগে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখি, চালের ছিদ্র দিয়া মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য্যরশ্মি আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের বাহিরে আসিয়া পিতাকে দেখিতে পাইলাম না! তৎ-পরিবর্ত্তে দেখিলাম, পিতার বৃদ্ধ কৃষক-প্রজা হরিহর, আমার

স্নান ও ফলাহারের ব্যবস্থা করিয়া, প্রাঙ্গণে বসিয়া আমার জাগরণের অপেক্ষা করিতেছে।

(৮)

তিন বৎসর আমি গ্রামান্তরে এক দূর সম্পর্কিয়া মাতৃস্বসার গৃহে মমতাময় পিতার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

মাসীমা নিঃসন্তান, পুত্রাধিক আদরে আমার প্রতিপালন করিতেছেন। মাঝে মাঝে হরিহর ফলটা পাকড়টা হাতে করিয়া আমার তত্ত্ব লইতে আসে।

আমাদের গ্রাম এ স্থান হইতে প্রায় এক দিবসের পথ। আসিলে হরিহরকে দুই এক দিন অপেক্ষা করিতে হইত। সে যখনই আসিত তখনই গ্রামের কোন না কোন্ একটা নূতন সংবাদ আমাকে শুনাইত।

একবার শুনিলাম, মাধব বাবুর সঙ্গে ভাগীরথীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়বার শুনিলাম, বিবাহের বিশেষ আয়োজন। রাধাপ্রসাদ বাবু বহু সমারোহের আয়োজন করিতেছেন।

মাঘ মাসের একটা নির্দ্দিষ্ট দিবসের সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে একা বসিয়া, আমি একটা অননুভূত বেদনার সহিত মাধব বাবুর

বিবাহের একটা ছবি দেখিতেছি, এমন সময় হরিহর আসিয়া সংবাদ দিল, নীলকুঠীর সাহেবের সঙ্গে রাধাপ্রসাদ বাবুর একটা বিষম ফৌজদারী মোকদ্দমা বাধিয়াছে। একটা দাঙ্গায় উভয় পক্ষের বহুলোক জখম হইয়াছে। সেইজন্য বিবাহ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিয়া গেল।

হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে কতকাল হইতে আবদ্ধ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আমি যেন নিশ্চিন্ত হইলাম।

ফাল্গুনের আর এক সন্ধ্যায় হরিহর আসিয়া সংবাদ দিল, মোকদ্দমায় রাধাপ্রসাদ ও মাধববাবু নিষ্কৃতি পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। তাঁহাদের সেই বাগান পুকুর বাঁধা পড়িয়াছে। বোধ হয়, ভাগীরথীর সেখানে বিবাহ হইল না। সুপক্ব কর্ম্মফলের আঘ্রাণ সেদিন বড় মধুর হইয়া আমার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে হরিহর আর একদিনের জন্যও আমার তত্ত্ব লইতে আসিল না! প্রথম প্রথম কয়দিন আগ্রহ-সহকারে প্রতীক্ষা, পরে বর্ষশেষে তাহার অনাগমন কামনা করিয়া, আমি একদিন নিরুদ্দিষ্ট পিতার উদ্দেশে দুই একবিন্দু অশ্রুপাত করিতেছি, এমন সময় ষোলটা বেহারা ও দুইখানা

পাল্কী লইয়া এক দ্বারবান আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

( ৯ )

নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া, বাহকদিগের ঐক্যতান গানের সহিত আমার সহস্রমুখী চিন্তার স্বর মিলাইয়া রাত্রির অন্ধকারে, কত মাঠ, কত গ্রাম, কত জলা জঙ্গল অতিক্রম করিলাম!

নিশীথে মাতৃস্বসার সহিত এক নবনির্ম্মিত অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি।

"মাসীমা! এ কোথায় আসিলাম?"

মাসীমা পাল্কী হইতে অবরোহণ করিয়া, আমাকে বলিলেন "চল না দেখি।"

আমার অবরোহণের সঙ্গে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। বাহির হইয়া দেখি, আমার সম্মুখে নববেশ পরিহিত, হুঁকা হাতে হাস্যময় হরিহর।

"এ কোথায় আসিয়াছি হরিহর?"

কেন বাবু! তোমার বাড়ী!"

"হরিহর! রহস্য করিয়ো না।"

"তবে বাবু! আমার মায়ের বাড়ী। মা ঠাকরুণ একটী খানসামা চেয়েছেন, তাই আমি তোমাকে আনিয়াছি।"

চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। বিস্ময়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। "তাইত হরিহর! আমাদের কুটীর?"

"বাণীকণ্ঠ!"

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম, পিতা। ছুটিয়া পিতার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলাম।

(১০)

সপ্তাহমধ্যে আমার সুসজ্জিত অট্টালিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। মহাসমারোহে পিতা, ভাগীরথীকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিলেন।

বৌভাতের দিন, নিমন্ত্রিত সমস্ত গ্রামবাসীদের সঙ্গে, সপুত্র রাধাপ্রসাদ বাবুও আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন।

অন্নব্যঞ্জনসজ্জিত পাত্রের সঙ্গে, অবগুণ্ঠনবতী ভাগীরথী কর্ত্তৃক একখানি দলিল রাধাপ্রসাদবাবুর আসনপ্রান্তে রক্ষিত হইল। তাহা দেখিয়াই সাশ্রুগদগদকণ্ঠে তিনি পিতার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"তবে কি আমি আপনারই কাছে ঋণদায়ে আবদ্ধ হইয়াছি?"

পিতা বলিলেন,—"আবদ্ধ আপনি কেন, আবদ্ধ আমি ও

আমার পুত্র। তবে আপনার এই গর্ব্বান্ধ পুত্রকে বুঝাইবেন, আপনার পিতৃপিতামহদত্ত যে মর্য্যাদা আমরা পিতৃপিতামহ হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহার ক্ষণস্থায়ী ধনগর্ব্বের সম্মুখে, কৌলীন্যমর্য্যাদা, সেই কোন্ দূরসময়াগত হিন্দুরাজদত্ত আভিজাত্যকে অবনত করিতে গিয়াই আমার পুত্র "কর্ম্মফল"প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার ধর্ম্মপত্নী তাহার হইয়া এই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।"

লজ্জায় মাধববাবুর মস্তক অন্নপাত্রে সংলগ্নপ্রায় হইল।

---

# নির্ব্বাসিত

## ( ১ )

তাহার নাম ছিল বিধুভূষণ, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে আদর করিয়া বিদ্যাভূষণ বলিয়া ডাকিত। কেননা বিদ্যার সহিত বিধুভূষণের এমন একটা অকৈতব প্রেম জন্মিয়াছিল যে, বিংশবর্ষ অতিক্রম করিতে বসিয়াও সে গ্রামস্থ ছোট বিদ্যাকুটীর অর্থাৎ গুরুমহাশয় গোলাম হাজরার পাঠশালার মায়া ছাড়িতে সমর্থ হইল না।

প্রতিবাসীরা যখন দেখিল বিধুর পাঠশালা-মায়া আপনা আপনি ছাড়িবার নহে, তখন সকলে মিলিয়া একদিন এই বিদ্যালয়গামী নবজাত-শ্মশ্রু যুবকের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।

সেই দলের ভিতর সপুত্র রামধন চাটুয্যে, সপৌত্র হরিরাম ঘোষাল, ও সশিষ্য পঞ্চানন তর্কনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বিধুভূষণ রামধনের পুত্র রামরূপের হাতে খড়ি দিয়াছিল,

দিন দুই চারি তাল পত্রে 'ক-খ' লিখাইয়াছিল। সেই রামরূপ বি,এ পাশ করিয়া দুইদিন পূর্ব্বে দেশে ফিরিয়াছে।

হরিরামের পৌত্র নিধিরামেরও ভাগ্যে, দুই একদিনের জন্য বিধুভূষণের ছাত্রত্ব ঘটিয়াছিল। সে বালকও গত বৎসর মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া এবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সুতরাং বিদ্যাভূষণের যশঃসৌরভ তাহার গ্রামের চারিপাশে দশবারোখানা গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

যুবক বিদ্যাভূষণের পাঠশালায় যাইতে লজ্জাবোধ হইত না বলিয়া, পাড়াপড়শীর এ দৃশ্য দেখিতে যে লজ্জা বোধ হইবে না, এরূপত কোন কথা নাই! সকলেইত আর বিদ্যাভূষণের মত নির্লজ্জ নহে।

তাঁহারা প্রথমে বিধুর মা বিন্দুবাসিনী দেবী, ওরফে বিন্দী বামনীকে ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। বিন্দু তাঁহাদের কথা রাখিল না। পরন্তু পুত্রের দৈনন্দিন উন্নতিতে তাঁহাদের অভদ্রোচিত ঈর্ষা দেখিয়া, সে যত পারিল তাঁহাদের আচরণের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল। বিন্দু বুঝিয়াছিল, তাহার পুত্র যে দিন পাঠশালা হইতে বাহির হইবে, সে দিন সে

একটি ছোটখাটো চাণক্য পণ্ডিত হইয়া, এই ইংরাজীপড়া ছোঁড়াদিগের ঈর্ষান্বিত বাপগুলার মুখে কালী লেপিয়া দিবে।

কিন্তু ঈর্ষান্বিত বাপগুলা বিদ্যাভূষণকে চাণক্য হইবার অবকাশ দিল না। তাঁহারা আজ তাহার বিদ্যামন্দির গমনের পথরোধ করিতে বদ্ধপরিকর।

রামধন চাটুয্যে বিধুর বগল হইতে শিশুবোধ-কথামালার পুঁটলীটা বাহির করিয়া লইলেন, হরিরাম কাড়িয়া লইলেন দোয়াতটা, আর তর্কনিধি পশ্চাৎ হইতে বিধুর বাহুমূলদ্বয় ধরিয়া, জোর করিয়া তাহার মুখটা বাটীর দিকে ফিরাইয়া দিলেন। আর বলিলেন—

"আঁটকুড়ীর ছেলে! তোমার জন্য আমরা যে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারি না। আর যদি কোনও দিন তুমি পাঠশালার দিকে মুখ ফিরাও, তাহা হইলে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিব।"

পুস্তকের পুঁটুলি ও মস্যাধার পথপার্শ্বের নালার কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত হইল।

ব্যাপার দেখিতে বহুলোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। গোবিন্দ গোলাওয়ালা বলিল—"আমি ঠাকুরকে বহুদিন হইতে

নিষেধ করিয়া আসিতেছি। আমার দোকানে একটা মুহুরীগিরি পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছি।"

চন্দ্র তরফদার বলিল—"আমার নাতী বলে, 'আমি বিদ্যাভূষণ ঠাকুরদাদাকে বোধোদয়ের পড়া বলিয়া দিই।'"

পাকড়াশীদের ছেলে কেষ্টাটা অমনি ট্যাঁক করিয়া বলিয়া উঠিল—"সেদিন গুরুমহাশয় বিদ্যাভূষণ কাকাকে 'নীল-ডাউন' করিয়া দিয়াছিলেন।"

কেবল গুরুমহাশয় গোলাম হাজরা সংবাদ পাইয়া বিজ্ঞদিগের এ অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে ছুটিয়া আসিল। বিধুভূষণের ছাত্রত্বে তাহার অনেক প্রকারের লাভ ছিল। গুরুভক্ত যুবক তাহার গৃহের অনেক কাজ করিয়া দিত। আর বিন্দুবাসিনীর কাছে, পুত্রের অচিরে চাণক্যত্ব প্রাপ্তির আভাষ দিয়া, তাহার মাঝে মাঝে চালটা, ডালটা, গুড়টা, নারিকেলটা লাভ হইত। কিন্তু প্রতিবাদ করিতে আসিয়া গোলামের ভাগ্যে বিজ্ঞগণের তিরস্কার ঘটিল।

পরদিন প্রভাতে বিন্দুবাসিনীর করুণ রোদনে পাড়ার নরনারী প্রবুদ্ধ হইয়া, কারণ জানিতে গিয়া বুঝিল, বিদ্যাভূষণ মনের দুঃখে গ্রামত্যাগ করিয়াছে।

( ২ )

বিন্দুবাসিনী রামধন চট্টোপাধ্যায়ের জ্ঞাতিকন্যা। তাহার পিতা তাহাকে এক কুলীনের হাতে সমর্পণ করিয়া কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামী 'বন্দ্যোপাধ্যায়' মহাশয়ের বিন্দুবাসিনী ছাড়া আরও অনেক স্ত্রী ছিল। যে সকল স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহার অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহাদেরই গৃহে গতিবিধি করিতেন। বিন্দুর পিতার তেমন সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং এই স্বামি-বিয়োগ-বিধুরার ভাগ্যে কদাচিৎ স্বামিসন্দর্শন সুখ ঘটিত।

কিঞ্চিদধিক উনবিংশবর্ষ পূর্ব্বে এই বহুবল্লভ ঠাকুরটী জায়া-রূপিণী বিন্দুবাসিনীকে একটী আত্মজ রত্ন দান করিয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বিধুভূষণের আর পিতৃপরিচয় ভাগ্যটা ঘটিয়া উঠে নাই। বিন্দুবাসিনী বারোবৎসর পর্য্যন্ত স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, যুগশেষে হাতের লোহা ফেলিয়া, সিঁথের সিন্দুর মুছিয়া বিধবার বেশ ধারণ করিয়াছে।

বিন্দুর সংসারে এখন তাহার প্রিয়পুত্র বিধু ভিন্ন আর কেহ ছিল না। তাহার পিতার যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই

মাতা ও পুত্রের কোনও প্রকারে দিনযাপন হইত। এই পুত্রই বিন্দুর একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশা। সেই পুত্র পাড়ার বিজ্ঞজনকর্তৃক অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিল, সুতরাং অভাগিনীর মনোবেদনার আর সীমা রহিল না। সে প্রভাতে উঠিয়াই আত্মীয়গণের নাম লইয়া রোদন করিতে লাগিল।

তর্কনিধির স্ত্রী স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"বুড়ো মিন্‌সে! তুমি দলের সঙ্গে যোগ দিতে গেলে কেন?"

তর্কনিধি মহাশয় সে সময় একটা হুঁকায় মাঝে মাঝে টান দিতে দিতে আকাশের কোন অরুণতরঙ্গাকুলিত দৃশ্যের দর্শনলাভাশায় উর্দ্ধনেত্রে তন্ময়ত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীর প্রশ্নের যে কি উত্তর দিয়াছিলেন, বিন্দুবাসিনীর আর্ত্তরবপূরিত আমাদের বধির কর্ণে তাহা প্রবেশলাভের সুবিধা পায় নাই।

( ৩ )

বিধুভূষণের বুদ্ধি যাহাই হউক, কিন্তু সে শান্তপ্রকৃতির বালক বলিয়া গ্রামের ভিতরে তাহার একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। শুধু তাই নয়, বিধু পরকে আপনার জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদের সেবাতৎপর ছিল! গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ কখন বিপদে পড়িলে

বিধু ভিন্ন সে বিপন্মুক্তির উপায় ছিল না। রাত্রে কাহারও ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইয়াছে, পল্লীগ্রামের গুল্মবহুল বনমধ্যস্থ সরীসৃপসঙ্কুল পথে সেই অন্ধকারময় রাত্রে গ্রামান্তরে কে যাইবে? যাইবে বিদ্যাভূষণ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিধবার ক্ষুদ্র বালক খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, তখনও পর্য্যন্ত ঘরে ফিরে নাই—কে তাহাকে খুঁজিতে যাইবে? যাইবে বিদ্যাভূষণ। কোন গৃহস্থকন্যার আজ হাটে যাইবার লোক নাই, বিদ্যাভূষণ তাহার জন্য জিনিষ আনিতে হাটে চলিল। কেহ সদ্যপ্রসূতা গাভীটীর সন্ধান পাইতেছে না, বিদ্যাভূষণ তাহাকে খুঁজিয়া আনিল।

বই কাড়িয়া লইবার জন্য বিধু যে দেশত্যাগ করিবে এটা কেহই বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং বিধুর অদর্শনে দুই একজনের আমোদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, গ্রামস্থলোকের অধিকাংশই দুঃখিত হইল। স্বয়ং তর্কনিধি মহাশয় ত অপ্রতিভ। মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর তিরস্কার শুনিয়াও তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত।

বিধুভূষণ গ্রামের মধ্যে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। এইজন্য তর্কনিধি মহাশয় তাহাকে একমাত্র কন্যা ক্ষমাসুন্দরীকে দান করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। মেয়েটী তাঁহার শেষ জীবনের এবং আদরের;—বিবাহ দিয়া তাহাকে চোখের অন্তরাল না করিতে

হয়, এইটীই তাঁহার ইচ্ছা। অবশ্য ক্ষমাসুন্দরীর দানের কথা তিনি মনে মনেই রাখিয়াছিলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি গৃহিণীর কাছে কথাটা পাড়িয়াছিলেন মাত্র। সেই অবধি তর্কনিধি-গৃহিণী অন্নদা দেবী বিধুভূষণকে কতকটা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এক এক দিন স্বামীর টোলে পড়িতে আসিয়া, যখন বিধু পাঠ ফেলিয়া, ক্ষমাসুন্দরীর খেলার ঘর রচনায় নিযুক্ত হইত, তখন ব্রাহ্মণকন্যার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তিনি কন্যা ও ভাবী জামাতার জন্মান্তরের দাম্পত্য জীবনের একটী ছবি দেখিতে পাইতেন। বিধুর নির্ব্বাসনে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া, নিত্য সময়ে অসময়ে স্বামীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তর্কনিধি মহাশয়ের বিধুর উপর ক্রোধ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি বিধুকে মানুষ করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিন কয়েক, তিনি তাহাকে পাঠশালা হইতে আনাইয়া নিজের টোলের ছাত্রবৃন্দের ভিতর বসাইয়া দিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধের দুই একটা সূত্র তাহার কণ্ঠাধঃ-কৃত করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু তর্কনিধির শত চেষ্টায়ও বিধুর কোমল রসনা দিব্যকাঠিন্যযুক্ত—'সহর্ণের্ঘঃ' 'আদিগোচোণ্‌ব্রীঃ' 'ঢ্রোঢ্রীর্ঘশ্চানু,' প্রভৃতি ব্যোপদেব বাক্যের রস গ্রহণে সমর্থ

হইল না। দরিদ্র রসনা বার দুই তিন দন্তাহত ও রক্তাক্ত হইয়া, তিনদিন নিরীহ যুবকের আহারের ব্যাঘাত উৎপাদন করিল। সন্তানবৎসলা বিন্দুবাসিনী আবার তাহাকে গুরুমহাশয়ের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিল। তর্কনিধিও নিশ্চিন্ত হইয়া, তাহার পাঠশালা হইতে শুভ নিষ্কৃতিলাভ দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে তাঁহার ক্ষমার এগার বৎসর পার হইয়া গেল, গ্রামে তাহার সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহই আর অবিবাহিত রহিল না। ইতিমধ্যে রামধনের পুত্র তিনটা ইংরাজী পাশ করিয়া ফেলিল, হরিরামের পৌত্রও ইংরাজীতে লায়েক হইতে চলিল; তথাপি আঁটকুড়ীর নন্দন বিধুভূষণ পাঠশালা হইতে বাহির হইল না। তর্কনিধি ক্রোধে বিধুর বিদ্যার্জ্জনের পথরোধ করিতে রামধনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন।

( ৪ )

বিধুর নির্ব্বাসনে রামধন চট্টোপাধ্যায়ের একটু স্বার্থ ছিল। তর্কনিধিগৃহিণী কথাপ্রসঙ্গে একদিন চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর কাছে, ক্ষমার বিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর অভিপ্রায়টা প্রকাশ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায়পত্নী, ক্ষমার মা'র নিষেধসত্ত্বেও স্বামীকে সে কথাটা

বলিয়া উদরাধ্মানের ও অগ্নিমান্দ্যের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। শুনিয়া চট্টোপাধ্যায়ের মনে ঈর্ষা জন্মিল।

তাহার কারণ তর্কনিধি মহাশয়ের বেশ দু'পয়সা সঙ্গতি ছিল। সেই সম্পত্তির অধিকারিণী ওই একমাত্র কন্যা। ক্ষমা দেখিতে যদিও ততটা সুন্দরী ছিল না, কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার স্মরণ মাত্রেই তর্কনিধির লোহার সিন্ধুক ভেদ করিয়া আর একটা যে অপরূপ সৌন্দর্য্য মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গে ঢাকাই মসলিনের মত জড়াইয়া তাহাকে আরব্যোপন্যাসের পরী করিয়া তুলিয়াছিল, চাটুয্যে মহাশয় অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না, তাহার চেয়ে অপ্সরার রূপ কত বেশি। ফলে চিন্তা করিতে করিতে ত্রিদিব-কামিনীদিগের হরিচন্দনপুষ্পরেণুসম্পৃক্তা শ্রী ক্ষমার রূপের কাছে মলিন হইয়া গেল। এমন সর্ব্বলাবণ্যময়ী কন্যা, তাঁহার কন্দর্পকান্তি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রামরূপ বাবাজীবন বর্ত্তমান থাকিতে কিনা শ্রীহীন গণ্ডমূর্খ বিধুভূষণের হাতে পড়িবে!

ক্ষমার দুঃখে তাঁহার প্রাণটা যেন গলিয়া গেল। আর অদূর ভবিষ্যতের এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকার পিতৃপিতামহসঞ্চিত অর্থের অযথা ব্যয় তাঁহার কল্পনাচক্ষে জাগিয়া হৃদয়টাকে বড়ই প্রপীড়িত করিতে লাগিল।

কিন্তু তিনি কেমন করিয়া তর্কনিধির কাছে কথাটা পাড়েন! একে তিনি কুলীন, তাহার উপযুক্ত ছেলের রূপগুণের কথা শুনিয়া কত দিগ্‌দেশ হইতে কত 'হট্টমালার' সম্বন্ধ কথা লইয়া কত ঘটক নিত্য তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতেছে। সবার উপর কথাটা নিজে পাড়িলে বিবাহের পণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। নিরুপায়ে চট্টোপাধ্যায় প্রিয়বন্ধু হরিরামের সাহায্যার্থী হইলেন।

তখন রামরূপ বি, এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, আর বোকা বিধুভূষণ তর্কনিধির টোলে বসিয়া, 'ষ্টুভিষ্টস্দাস্তটোঃ' বাক্যটা রসালবীজবৎ মুদিতনয়নে চর্ব্বন করিতেছে। এমন সময় হরিরাম রামরূপের দূরদেশ যাত্রার শুভদিন দেখাইবার ছলে তর্কনিধির কাছে উপস্থিত হইল।

( ৫ )

তর্কনিধি তখন 'দাস্তটোঃ'-রূপ আঁটিটী বিদ্যাভূষণের সূক্ষ্ম গলছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে অসমর্থ হইয়া, ক্ষমার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে অসার খলুসংসারের উপর চটিয়াছেন, এবং তাহাকে ধূম্রাচ্ছাদিত করিয়া লোকলোচনের অন্তরালে ফেলিবার জন্য হুঁকা হাতে করিয়াছেন।

দু'টা একথা সেকথা—'তিথ্যমৃতযোগ' 'উত্তরে যোগিনী'—বারবেলা, কালবেলার পর, হরিরাম রামরূপের কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"রামরূপ বি, এ পাশ দিতে কলিকাতায় যাইবে, তাই তার বাপ আপনার কাছে যাত্রার দিনটা দেখাইতে পাঠাইয়াছেন।"

তর্কনিধি বাম হাতে হুঁকা ধরিয়া, দক্ষিণ হাতে পাঁজি লইলেন। হরিরাম কথাটা শুনাইয়াও তর্কনিধির মুখে কোন ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন না। তর্কনিধি পাঁজির পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাত্রার শুভদিন বাহির করা দূরে থাকুক, সমস্ত পাঁজির ভিতরে তিনি একটা দিন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তিনি রামরূপ ও বিদ্যাভূষণের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে বিনির্গত এক বিরাট মায়া পাঁজির পাতে পাতে অঙ্কিত দেখিতেছিলেন।

তামাক টানিতে টানিতে হরিরাম বলিলেন—"আহা! রামরূপটা কেমন ছেলে!"

কোনও উত্তর পাইলেন না। দিন দেখায় তর্কনিধি ব্যস্ত ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষার পর হরিরাম আবার বলিলেন—"আহা কেমন ছেলে!"

তর্কনিধি বলিলেন—"বাঁদর।"

হরিরামের চক্ষু কপালে উঠিবার আয়োজন করিল। "সেকি তর্কনিধি! অমন সোণার ছেলে বাঁদর!"

যাহাকে ভালবাসি তার সহস্রদোষ থাকিলেও, যদি কেহ তাহার এক-আধটা কাল্পনিক গুণও সময় বুঝিয়া শুনাইয়া দেয়, তাকে বুঝি সব দিতে ইচ্ছা হয়। বিধুকে তর্কনিধি একটু আন্তরিক ভালবাসিতেন। তাই হরিরামের কথাটা বিধুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া তাহার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিলেন—

"তোমরা সবাই বল সোণার ছেলে, কিন্তু আমি হতভাগ্যের জন্য হাড়ে-নাড়ে জ্বলিয়া মরিলাম। সাতদিনে একটা সূত্র উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না।"

হরিরামের ধড়ে প্রাণ আসিল। হুঁকার একটা টানে আপাদমস্তক ধূমপূর্ণ করিয়া, তর্কনিধিকে সেটা ফিরাইয়া দিয়া, ধূম্রমিশ্রিত অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি বিদ্যাভূষণের কথা বলিতেছিনা, রামরূপের কথা বলিতেছি।" তর্কনিধি তখন নিজের ভ্রম বুঝিলেন। তাঁহার অপ্রতিভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অশাস্ত্রীয় ক্রোধ হৃদয়ে পুনঃ সঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"ও দুইই সমান।"

হরি। কেমন করিয়া ?

তর্ক। বিদ্যালাভ না হইলে, বাঁদর না হইয়া কি হইবে ?

হরি। সেকি তর্কনিধি মহাশয় ! বালক এই বয়সে যে তিনটা পাশ করিয়া ফেলিল।

তর্ক। করিয়া ভূত হইল। সে আমাকে শিখাইতে আসে। আমি একদিন ছাত্রদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপদেশ দিতেছি—সূর্য্য নিত্য কেমন করিয়া ঘুরে বুঝাইতেছি—এমন সময় জ্যাঠা ছেলেটা কোথা হইতে আসিয়া আমাকে বলিল, পৃথিবী ঘুরিতেছে। কালকের ছেলে, সে তর্ক করিয়া আমাকে বুঝাইতে চায়। আরে মূর্খ! পৃথিবী যদি ঘুরিত, তাহা হইলে, এতদিনে তোর বাবার তেএঁটে মাথার সঙ্গে তোর কচি মাথার ঠোকর লেগে ঘী বাহির হইয়া পড়িত।

হরিরাম স্বকীয় ঘটকালীর বিফলতা রামধনকে জ্ঞাত করিলেন।

( ৬ )

রামরূপের বি, এ পাশের খবর আসিয়াছে। বিদ্যাভূষণের, টোল ছাড়িয়া পাঠশালায় আবার "প্রমোসন" হইয়াছে।

হরিরাম আবার তর্কনিধির কাছে যাতায়াত করিতেছেন,

আর মাঝে মাঝে রামরূপ সম্বন্ধে একটা আধটা সুবিধামত কথা বলিতেছেন। একদিন তিনি বলিলেন, রামরূপকে জেলার বড় সাহেব ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

তর্ক। বেশ।

হরি। তিনি বলেন, তোমাকে আমার এখানে একটা চাকরী দিতে ইচ্ছা করি।

তর্ক। খুব সদিচ্ছা।

হরি। কিন্তু রামরূপ চাকরী করিতে রাজী হইতেছে না।

তর্ক। কেন?

হরি। সে বলে, আমি একেবারে হাকিম হইব।

তর্ক। বটে!

হরি। কাজে-কাজেই সাহেব সেকহ্যাণ্ড করিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছেন।

সেকহ্যাণ্ডের অর্থ বুঝিয়া তর্কনিধি বলিলেন—"তাহাকে গঙ্গাজলে হাত ধুইতে বলিয়ো। কেননা সাহেবেরা অখাদ্য খায়।"

সুতরাং সেবারেও হরিরাম বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। আর একদিনের কথা—

হরি। পাইতাড়ার রাজার মেয়ের সঙ্গে রামরূপের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।

তর্ক। শুনিয়া সুখী হইলাম।

হরি। মেয়ের বাপ্ একটা জমীদারী দিবে বলিয়াছে।

তর্ক। আহা বাঁচিয়া ভোগ করুক!

হরি। কিন্তু তাহার বাপ রাজী হইতেছে না।

তর্ক। তার দুর্ব্বুদ্ধি।

হরি। মেয়েটী কালো।

তর্ক। রূপ লইয়া কি ধুইয়া খাইবে! তুমি তাহাকে রাজী হইতে বল।

হরি। বলিয়া দেখিয়াছি।

তর্ক। কথা শুনেনা?

হরি। বলে, ছেলে কালো মেয়ে বিয়ে করিতে চায় না।

তর্ক। ও! আজকালিকার ছেলে, বাপের পছন্দে তার পছন্দ হয় না। সাধে কি আর দেশে এত আফিমের দর চড়িয়াছে।

আফিমের সঙ্গে মেয়ে-পছন্দের কি সম্পর্ক বুঝিতে না পারিয়া,

হরিরাম বলিল—"আপনার কন্যাটী দিব্য মেয়ে।" তর্কনিধি আনন্দের আবেগে হাস্য করিলেন।

হরি। যথার্থ কথা বলিতে গেলে, অমন সুলক্ষণযুক্ত মেয়ে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

তর্ক। তবু কয়দিন মা আমার রোগা হইয়া গিয়াছে।

হরি। কেন—কোন অসুখ করিয়াছে কি ?

তর্ক। তাতো বুঝিতে পারিতেছি না।

হরি। বিবাহযোগ্য হইল—বিবাহ দিতেছেন না কেন ?

এমনি সময়ে ক্ষমা একটী সুন্দর খাঁচা হাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তর্কনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন—"খাঁচা কে দিল রে ?"

ক্ষমা বলিল—"বিধুদাদা তইরি করিয়া দিয়াছে।"

তর্কনিধি অমনি বলিয়া উঠিলেন—"হতভাগাটার অশেষ গুণ। ক্ষমার পুতুলের জন্য এমন সুন্দর ঘর করিয়া দিয়াছে, এমন খয়েরের বাগান রচিয়াছে যে, দেখিলে বিশ্বকর্ম্মার শিল্প বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু মা সরস্বতী কেন যে ছোঁড়াটার উপর বিরূপ

তা' বুঝিতে পারিলাম না।" হরিরাম বলিলেন—"বোধ হয় ছোকরা আরজন্মে রাজমজুর ছিল।"

বিদ্যাভূষণ আরজন্মে যাই থাকুক, সেদিনও হরিরাম কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। তখন হতাশ হইয়া, তিনি রামধনের দৌত্য কার্য্যে ইস্তফা দিলেন।

রামধনের জেদ বাড়িল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, তর্কনিধির কাছে কিছুও যদি না পাই, তথাপি তাহার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিব।

তিনি নিজে যাইয়া তর্কনিধির কাছে প্রস্তাব করিলেন। প্রথম দুই চারিদিন কোনও উত্তর পাইলেন না। একদিন তর্কনিধি বলিলেন—'ভাবিয়া দেখি,' অপর একদিন তর্কনিধি বলিলেন—"আমি বেশী কিছু দিতে পারিব না।"

রামধন বলিলেন—"আপনি হরিতকী দক্ষিণা দিয়া কন্যা দান করিলে, তাই আমার যথেষ্ট হইবে।"

বাস্তবিক তর্কনিধি একদিন নিজচক্ষে দেখিলেন, রামধন পাঁচ হাজার টাকা পণ ও সেই সঙ্গে সুন্দরী কন্যাদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ এইবারে ফাঁপরে পড়িলেন। এবং মনের আবেগে

বিদ্যাভূষণকে মনে মনে অজস্র গালি দিলেন। তারপর গৃহিণীর কাছে আসিয়া বলিলেন—"রামরূপের সহিত ক্ষমাসুন্দরীর বিবাহ দিব।"

মেয়ে দেখিতে দেখিতে ডাগর হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং অন্নদা সুন্দরী বিদ্যাভূষণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিলেন এইমাত্র,—বিবাহে 'না' বলিতে পারিলেন না।

বিদ্যাভূষণের নির্ব্বাসনের একমাস পরে, একটা সুতহিবুক যোগে ক্ষমাসুন্দরীর সঙ্গে রামরূপের বিবাহ হইয়া গেল। বিধুভূষণের জননীর সেদিনকার সান্ধ্য রোদন, রামধনের গৃহিণীর শঙ্খধ্বনিতে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

( ৭ )

ইহার পর পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসরে রামরূপ এম, এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর ক্ষমাসুন্দরী শ্বশুরগৃহ হইতে পিতৃগৃহে বার পঞ্চাশ যাতায়াত করিয়াছেন। তাহার কারণ, তর্কনিধির নিকট হইতে শুদ্ধমাত্র একটা হরিতকী দক্ষিণা লইয়া, চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কন্যাটীকে পুত্রবধূত্বে গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিতকীটা কোন অবস্থা-

পন্ন হইবে, সেটা পাকা-দেখার সময় স্থির হয় নাই। সেই জন্য বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি গৃহিণীর অনুরোধে একটি পক্ক হরিতকীর দাবী করিয়া বসিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ জাতিকুল বজায় রাখিতে, বিদ্যাভূষণের অপমানের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পঞ্চসহস্র রজতখণ্ড বৈবাহিককে দান করিয়াও পাঁচবৎসর মধ্যে পক্ক হরিতকীর ঋণমুক্ত হইতে পারিলেন না।

মধ্যে মধ্যে চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর, পুত্রবধূটীর উপর তাগাদা পড়িত। "আজ বৎস রামরূপ গাউন পরিয়া কলিকাতায় বড়লাট সাহেবের নিকট হইতে ডিপ্লোমা আনিতে যাইবে। তর্কনিধির পূর্ব্বজন্মার্জিত ভাগ্যে জামাতার সে শোভা দেখিবার যদি সাধ থাকে, ত এখনি একশত টাকা দান করুক। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার কন্যাকে ঘরে লইয়া যা'ক্। আমি আবার পুত্রের জন্য অন্য ভাগ্যবতীর অনুসন্ধান করি। আজ পুত্রকে হাকিম করিবার জন্য স্বয়ং রাজরাজেশ্বরীর নিকট হইতে সনন্দ আসিতেছে। সেই সনন্দ আনিতে হইলে, বাছাকে চতুর্দ্দোলায় চাপিয়া বড়লাটের বাড়ী যাইতে হইবে, তাহাতে তর্কনিধির কন্যারই ভবিষ্যতের বাঁধা সুখ। সুতরাং এই অমূল্য পদমর্য্যাদার সুখটী লাভ করিতে, পাথেয়স্বরূপ যে কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর রৌপ্য-

মুদ্রার প্রয়োজন হইবে, তাহা তর্কনিধি ভিন্ন অন্যে দিতে যাইবে কেন ?”

কাজেই মাঝে মাঝে কন্যাকে অর্থের প্রত্যাশায় পিতৃগৃহে যাইতে হইত।

বারংবারের তাগাদায় তর্কনিধির প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। অথচ বিচারদণ্ড হাতে করিলে, বাছার কচি হাতের কবজীতে ব্যথা লাগিবে বলিয়া, রামরূপের হাকিম হওয়া হইল না। আর জেলা-কোর্টে ওকালতী করিতে গিয়া, তাহার গলায় সর্দ্দি বসিয়া গেল বলিয়া,তাহার ওকালতীতেও সুবিধা হইল না। জজ সাহেব একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—“তুমি ইস্কুল-মাষ্টারীর চেষ্টা কর। একটা তুচ্ছ অর্থহীন ফাঁকা কথা লইয়া মেয়েলী ঝগড়া করা তোমার ন্যায় বীর পুরুষের কার্য্য নয়।”

সাহেবের আদেশ অমান্য করা ভদ্রতার সীমা বহির্ভূত বলিয়া, রামরূপ মাষ্টারী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘরে ফিরিল।

চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী বুঝিলেন, স্বামী না বুঝিয়া একটা অলক্ষণা কন্যা গৃহে আনিয়াছেন। সুতরাং এরূপ কন্যার বাপ ও মা—দুইজনেই যখন তাহার লক্ষণহীনতার জন্য দায়ী, তখন হয় তারা পুত্রের কোন একটা চাকরীর ব্যবস্থা করুক, না হয় ‘বাণিজ্যে

বসতে লক্ষ্মী' শাস্ত্র বাক্যটার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য, রামরূপকে কতকগুলি টাকা দিয়া যে কোন একটা কারবারে নিযুক্ত করুক।

তর্কনিধি বৈবাহিকার এই সৎপ্রস্তাবে আপনাকে অনুগৃহীত বিবেচনা করিলেন। এবং বৎস রামরূপকে একদিন নিকটে পাইয়া বলিলেন, "বৎস! এখন তোমার জ্ঞানমাহাত্ম্যের পরিচয় পাইতেছি। এখন বুঝিতেছি, পৃথিবীই অহর্নিশি ঘুরিতেছে।"

( ৮ )

রামরূপ কিন্তু এ সত্য বাক্যের সার গ্রহণে অসমর্থ হইল, এবং শ্বশুরের প্রতি কুপিত হইয়া, মায়ের কাছে সকল কথা প্রকাশ করিল, বলিল—"ও টুলো বামুনের সঙ্গে যদি আর সম্পর্ক রাখ, তাহা হইলে আমি দেশত্যাগী হইব।" চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন—"যদি বাছার আমার আবার বিবাহ না দাও, তাহা হইলে গলায় দড়ী দিয়া মরিব।"

রামধন মনে মনে বুঝিলেন—"এ বড় মন্দ কথা নয়। অর্থোপার্জ্জনের এমন সুগম পন্থা এতকাল বিস্মৃত হইয়াছিলাম কেন?"

দেশের দুর্ভাগ্য, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার

অবসর পাইলে অনেক সময়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। পুত্রের পুনর্ব্বিবাহের কথা রামধনের মনে জাগিতে না জাগিতে, পাত্রীর সন্ধান মিলিয়া গেল। সন্ধানদাতা হরিরাম ঘোষাল। রামরূপের প্রথম দৌত্যকার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়া, তর্কনিধির উপর তাঁহার ক্রোধ হইয়াছিল। সেই ক্রোধের ফলে তিনি ক্ষমাসুন্দরীর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। পাত্রীর পিতার অবস্থা ভাল নয়। এইজন্য কন্যাটীকে বয়স্থা করিয়া, তিনি কোন বিপত্নীকের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন এই সর্ব্বগুণাধার সপত্নীকের সন্ধান পাইয়া, তিনি অনিশ্চিত বিপত্নীকের আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং হরিরামের সঙ্গে মিশিয়া অভাগিনী ক্ষমার সর্ব্বনাশে অগ্রসর হইলেন।

এ কথা তর্কনিধি ও অন্নদাসুন্দরীর কাণে উঠিতে বাকী রহিল না। কন্যার দুঃখে মর্ম্মপীড়িত হইয়া চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ব্রাহ্মণ-দম্পতী ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু ফল হইল না। কন্যা ক্ষমার এত বয়স পর্য্যন্ত পুত্রহীনতার দোহাই দিয়া, তিনি কুলধর্ম্ম রক্ষায় সচেষ্ট,—তর্কনিধির মিনতিতে কর্ণপাত করিলেন না। তর্কনিধি, কন্যাকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

ক্ষমা এতকাল দেবতারও কাছে মনোভাব প্রকাশ করে নাই।

বিদ্যাভূষণের নির্ব্বাসনের পর হইতে এই এতকাল পর্য্যন্ত সে সুখী কি দুঃখী, অন্যের জানা দূরে থাক্, তাহার পিতা মাতা পর্য্যন্তও জানিতে সমর্থ হন নাই। রামরূপের বিবাহের পর হইতে তর্ক-নিধির সংসারে এই যে এত ঝড় চলিয়া গিয়াছে, সে সকল ঝড়ের প্রকোপ কেবল ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী সহ্য করিয়াছেন। অপমানে, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর তিরস্কারে, 'অর্থের জন্য নিত্য পীড়নে—এমন কি দাম্ভিক স্বামীর হৃদয়হীনতায়—কিছুতেই তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সমমর্ম্মী প্রতিবাসী-প্রতিবাসিনীরা তাহাকে বোকা মেয়ে বলিত।

একদিন ক্ষমাসুন্দরী অন্যমনে অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অন্নদাসুন্দরী স্বামীকে বলিতেছিলেন—"জামাইকে ব্যবসায় করিতে টাকা দিলেই যদি বিবাহটা বন্ধ হয়, ত কিছু টাকাই দাওনা কেন?"

ক্ষমা অন্তরাল হইতে কথা শুনিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া, বাহিরে আসিয়া বলিল—"সর্ব্বস্ব দিলেও তাহাদের মন পাইবে না, আমার যা হইবার তা হইয়াছে। তোমরা কেন বৃদ্ধ বয়সে ভিখারী হইবে।"

তর্কনিধি মর্ম্মবেদনায় গালে হাত দিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ

করিতেছিলেন। ক্ষমা বলিল—"কাঁদেন কেন বাবা! মূর্খের হাতে পড়িলে দুঃখে দিন যাইবে বলিয়া, আপনি পণ্ডিতের হাতে আমাকে দিয়াছিলেন। আমার অদৃষ্ট, তাহাতেও আমার দুঃখ ঘুচিল না।"

তর্কনিধি বলিলেন—"মা! নিরপরাধ ব্রাহ্মণসন্তানকে অপমানিত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়াছি। এ আমার সেই মহাপাপের ফল।"

ক্ষমা বলিল—"আমারও বোধ হয় তাই। ইহাদের টাকা দেওয়া অপেক্ষা, আপনি তাহার দরিদ্রা জননীকে টাকা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করুন।"

অন্নদাসুন্দরী বলিলেন—"ঠিক কথা। ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিয়াছে।"

ক্ষমা। সে ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিবে না জানি। কিন্তু তার মায়ের দীর্ঘনিশ্বাসে আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

বিস্মিতনেত্রে ব্রাহ্মণ, কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। "মা! আমার সঙ্গে কাশীবাস করিতে পারিবি?"

ক্ষমা। সেত আমার সৌভাগ্য। অরণ্যে বাস করেন ত, আমি সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।

( ৯ )

পরদিন প্রাতঃকালে তর্কনিধি, অর্থদানে ও ক্ষমাপ্রার্থনায় বিধুর নির্ব্বাসনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া দেখেন, বিন্দু দ্বার বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার পাড়ার লোকে কেহই তার খবর দিতে পারিল না। দুই এক দিন তাহার অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন বিন্দু আসিল না, তখন কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া ব্রাহ্মণ কাশী যাত্রা করিলেন।

তার পরদিন বৎস রামরূপের দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্বন্ধের শঙ্খধ্বনি হইল। স্থির হইল, একপক্ষ পরে বিবাহ হইবে। চট্টোপাধ্যায়ের যথেষ্ট প্রাপ্তি না হইলেও, নানা জাতীয় হিসাবে কন্যার পিতার নিকট হইতে, প্রায় দেড়হাজার টাকার দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা রহিল।

তৎপর দিন অন্যমনস্কে ষ্টেট্‌সম্যানের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভটা পরীক্ষা করিতে গিয়া রামরূপ দেখিল, রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে এক নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য একজন এম,এর প্রয়োজন। বেতন একশত টাকা।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রামরূপ উক্ত গ্রামের উদ্দেশে একখানা দরখাস্ত নিক্ষেপ করিল।

সপ্তাহমধ্যে টেলিগ্রামে প্রত্যুত্তর আসিল—"আবেদন গ্রাহ্য হইল, পত্রপাঠ রওনা হউন।"

বিদ্যুৎগতিতে এ শুভসংবাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইল। সকলে বলিল—"কন্যা কি সুলক্ষণা!"

বাধ্য হইয়া চট্টোপাধ্যায়কে ভাবী বৈবাহিককে জানাইতে হইল,—"দিন কয়েকের জন্য বিবাহ স্থগিত থাকুক। কেননা তাহার সুলক্ষণা কন্যার গুণে রামরূপ বাবাজীবনের হাকিমীর মত একটা চাকরী জুটিয়াছে। সেই পদ হইতেই বাবাজীবনের দুই দিন পরে জজ হইবার সম্ভাবনা।"

( ১০ )

কর্ম্মস্থানে যাইয়া অবধি রামরূপের সুখে দিন কাটিয়া যাই-তেছে। উত্তম আহার, সুন্দর বাসস্থান,—চাকরে নিত্য পরিচর্য্যা করিতেছে—অথচ এক পয়সা খরচ নাই। ইস্কুলের সেক্রেটারী প্রতিদিন তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

রামরূপ পিতাকে লিখিলেন—"বড়ই সুখে আছি।"

পিতা লিখিলেন—"তাতো আছ; কিন্তু বিবাহের কি? কন্যার পিতা আসিয়া নিত্য তাগাদা করিতেছে।"

রামরূপ উত্তর দিলেন—"বিদ্যালয়ের মালিকের সঙ্গে দেখা না করিয়া কিছু লিখিতে পারিতেছিনা।"

"তবে দেখা কর!"

"তিনি এখন কাশীতে—শীঘ্রই এখানে আসিবেন।"

পাঠক মনে রাখিবেন, এ উত্তর প্রত্যুত্তর চিঠিতে চলিতেছে।

দিন কয়েক পরে, পিতা পত্র পাইলেন—"মালিক কাশী হইতে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে পত্রে তাঁহার মনোভাব জানিয়া বুঝিয়াছি যে, ইস্কুলটী নূতন স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, তিনি এখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তবে একান্তই যদি আমাকে বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি এই স্থানেই বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছেন। এখানে আপনাদের সামান্যমাত্রও অসুবিধা হইবে না। আমার মনীব যেমন ধনবান, তেমনি সদাশয়। গ্রামের লোকও অতি ভদ্র।"

( ১১ )

আজ সন্ধ্যার পর রামরূপের সহিত মালিকের সাক্ষাৎ হইবার কথা। কাল ভাবীশ্বশুর, কন্যাকে লইয়া সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গে কন্যাপক্ষীয় দশ পনেরো জন লোক আসিয়াছে। মনীব তাহাদিগকে নিজগৃহে স্থান দিয়াছেন।

রামরূপ উত্তম বেশভূষা করিয়া, মনীব প্রেরিত লোকের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, এমন সময় গোলাম হাজরা গুরুমহাশয় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

রাম। একি, গুরুমহাশয়! আপনি এখানে?

গোলাম। আমি তোমাকে তোমার মনীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইতে লইতে আসিয়াছি।

রাম। আপনি এখানে কি সূত্রে আসিয়াছেন?

গোলাম। নিকটেই আমার একটী ছাত্র আছে, আমি তাহার কাছে আসিয়াছিলাম। আসিয়া শুনিলাম, এখানে তোমার বিবাহ হইতেছে। আমার সমস্ত ছাত্রের মধ্যে তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—আমার গর্ব্বের সামগ্রী। তোমার বিবাহ আমি দেখিতে আসিব না?

রাম। আমার মনীবের সহিত আপনার আলাপ কিসে হইল ?

গোলাম। তাঁর স্বামী আমার ছাত্র।

রাম। আমার মনীব কি স্ত্রীলোক ?

গোলাম। স্ত্রীলোক।

রাম। তাঁহার সঙ্গে কেমন করিয়া দেখা করিব ?

গোলাম। তাঁহার স্বামী নিকটে থাকিবেন।

গুরুমহাশয়ের সঙ্গে রামরূপ মনীব-দর্শনে চলিল।

( ১২ )

রামরূপের বাসা হইতে মনীবের বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা—যে রামরূপকে দেখিল, সেই তাহাকে সম্যক অভিবাদন করিল। মনীবের বাড়ীর সম্মুখে সুন্দর বাগান। সেই বাগানের মধ্য দিয়া অট্টালিকা প্রবেশের পথ। পথের দুই ধারে সারি সারি প্রস্তর-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পরেই রেলিং। রেলিংএর পরে পথের উভয় পার্শ্বে শিল্পকার্য্যময় তৃণগালিচার মধ্যে মধ্যে নানা জাতীয় আলেখ্যলিখিত-বৎ পুষ্পবৃক্ষ। দৃশ্য দেখিয়া রামরূপ মুগ্ধ হইল। ফটকের উভয়-

পার্শ্বে, পথের মধ্যে স্থানে স্থানে এবং বহির্দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতলে যাইবার সমস্ত সোপান-পথে সুন্দর বেশ পরিয়া, আশাসোঁটা হাতে অনেক ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল। রামরূপ যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি সকলে সসম্ভ্রমে সেলাম করিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া রামরূপ বিস্ময়ে যদি আত্মহারা না হইত, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে হইতে পারিত—"আমিই এ অট্টালিকার মালিক।"

হাজরা-মহাশয় তাহাকে একটী সুন্দর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করাইল। এই স্থানেই তাহার মনীবের সহিত সাক্ষাৎ।

মনীবকে দেখিয়াই বিস্মিত যুবকের মাথা ঘুরিয়া গেল। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! "ক্ষমা! তুমি এখানে?"

ক্ষমা। পতি-পরিত্যক্তা এরূপ স্থানে আসিবার যোগ্য না হইলেও ভাগ্যবশে এখানে আসিয়াছি।

রাম। আমি যাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেছি, তিনি কই?

এবারে গুরুমহাশয় ক্ষমার হইয়া কথা কহিলেন। "তিনি তোমার ওই সম্মুখে।"

ক্ষমা ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে অগ্রসর হইয়া, তাহার হাতে

একতাড়া কাগজ দিল। দিয়া বলিল—"এই সমস্ত দলিলে লিখিত সম্পত্তি আমার ভাবী-সপত্নীকে যৌতুক দিয়ো।"

রামরূপ দলিলে দৃষ্টিমাত্র নিক্ষেপ না করিয়াই, ক্ষমার পায়ে ধরিতে অগ্রসর হইল। ক্ষমা বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

রামরূপ বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—"ক্ষমা, এ নরাধম স্বামীকে ক্ষমা করিয়া নামের সার্থকতা রক্ষা কর।"

"তুমি ক্ষমার গুরু, তোমার উপর ক্রোধ করিবার ক্ষমার অধিকার কি?"

রামরূপ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—"কে আপনি?"

"আমি নির্ব্বাসিত।"

এখন যদি তর্কনিধি আসিয়া রামরূপকে বলিতেন যে—"বৎস রামরূপ পৃথিবীই ঘুরিতেছে," তাহা হইলে বৎস রামরূপ বোধ হয় আর শ্বশুরের উপর ক্রোধ করিত না। পৃথিবী ঘোরার কথা রামরূপ কেতাবেই পড়িয়া বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু আজ সে গতিশীলা ধরার বিদ্যুৎবেগে আত্মপরিক্রমণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

হাজরা বলিল—"বৎস রামরূপ! বিদ্যাভূষণ তোমার বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ। চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ কর।"

# চিত্র দর্শন

( ১ )

ওস্‌মান সা, অল্পদিন হইল, পিতৃবিয়োগে সিন্ধুর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। কিন্তু এখনও সুলতান অবিবাহিত। সুতরাং চারিদিক হইতে সুন্দর সুন্দর রাজকুমারীর সন্ধান লইয়া দূতেরা তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ উজীর সেই সকল চিত্র যুবক প্রভুর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধ ওস্‌মান সার পিতামহের আমল হইতে সিন্ধুদেশে উজীরী করিতেছেন।

ওস্‌মান চিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই উজীরকে বলিলেন—"আমি বিবাহ করিব না।"

"বিবাহ করিবেন না!"—বিস্ময়ে উজীরের চক্ষু কপালের দিকে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গেল।

ইহার পূর্ব্বে সিন্ধুর কোন রাজা কখনও বিবাহে আপত্তি করেন

নাই। সকলেই শাস্ত্রসম্মত চারিটী বিবাহ ত করিয়াই ছিলেন, তাহার উপর প্রত্যেকেরই বিশ পঞ্চাশটী বেগম ছিল। উজীরেরও চারিটী পত্নীর উপর অন্তত ৺গুটী বারো বেগম আছে। উজীর বলিলেন—

"রাজার এরূপ কথা মুখে আনিতে নাই।"

ওস্। কেন, আনিতে দোষ কি?

উজীর। ঈশ্বর আপনাকে প্রজা-পালনের জন্য দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন।

ওস্। দুনিয়াতে থাকিয়া আমি প্রজাই পালন করিব। সে জন্য বিবাহ করিতে হইবে কেন?

উজীর। বিবাহ না করিলে আপনি থাকিলেন কই।

ওস্। বরং বিবাহ না করিলে আমার থাকিবার সম্ভাবনা আছে। কেন না তাহা হইলে আমি প্রজা-পালনে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারিব।

উজীর। সে কয় দিনের জন্য? আপনার জীবন লইয়া আপনার রাজ্য নয়—আপনার বংশের জীবন লইয়াই রাজ্য। আপনি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার প্রতিনিধি স্বরূপ। সুতরাং আপনি নিঃসন্তান পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন।

ওস্। ভাল, আমাকে ভাবিতে সময় দিন।

নিরুপায়ে উজীর নবপ্রভুকে এক বৎসর সময় দিলেন। এই এক বৎসরে সুলতান সুশাসনে প্রজার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইল। প্রতিবাসী রাজারা তাঁহার বীরত্বের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন। আর রূপের কথা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল।

কাজেই নানাদেশ হইতে আরও কত সুন্দরীর সুসমাচার প্রতিদিন বৃদ্ধ উজীরের বিষম কর্ণকণ্ডূতি উৎপাদন করিতে লাগিল। কাণের জ্বালায় অস্থির হইয়া বৃদ্ধ আবার প্রভুর সমক্ষে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিলেন। তথনও বৎসর পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ হইতে সপ্তাহ মাত্র সময় অবশিষ্ট। প্রভুভক্ত বৃদ্ধের এ সাতটা দিনও বিলম্ব সহিল না।

( ২ )

কিন্তু কোথায় সুলতান ? রাজপ্রাসাদে যাইয়া উজীর সুলতানের সন্ধান করিলেন ; কিন্তু প্রাসাদের কোন স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন—সুলতান নাই। বিশ্রাম গৃহে—সুলতান নাই। প্রমোদশালায়—কেবল নর্ত্তকীরা বীণা যন্ত্রাদি লইয়া অসম্বদ্ধ অনৈক্য তানে—অসম্বদ্ধ লয়হীন গানে—অপেক্ষার হতাশে, মৃদু পরিহাসে, সুখ-দুঃখের নানাকথায় বন্দিনীর সময়টা কোনও প্রকারে যাপন করিতেছে—কোথায় সুলতান?

নগরের প্রান্ত দিয়া সিন্ধুনদ প্রবাহিত। তাহার তীরে রম্য রাজোদ্যান। সেই উদ্যান মধ্যে মতিমহল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই ইহা একরূপ পরিত্যক্ত। কেন, তাহার কারণ কেহ বলিতে পারিত না। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুমান করিত এইমাত্র। এক বৃদ্ধমালী ওস্মানের পিতামহের সময় হইতে এই উদ্যান রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। নগরবাসীর সহিত তাহার বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। মাসখানেক হইল, সেও মরিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এখনও তাহার পদে নিযুক্ত হয় নাই।

অস্তগামী সূর্য্য সিন্ধু-তরঙ্গের শীকর-কণায় রং মাখাইয়া সেদিন সেই মর্ম্মর প্রাসাদকে মনের আবেগে আকুল করজালে আদর করিতেছিলেন।

কোথাও না দেখিতে পাইয়া, উজীর সেই সন্ধ্যায় সেই উদ্যানে সুলতানের সন্ধানে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ দ্বারেই একটী সুন্দর বালক কাঞ্চনলতার মত দু'খানি ছোট হাত বাড়াইয়া, তাঁহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।

বালক। কোথা যাও?

উজীর। তোমাকে বলিব কেন?

বালক। আমাকে না বলিলে যাইতে পারিবে না।

বালকের মুখে চোখে এবং শুভ্র দন্ত-পংক্তিতে অরুণ কিরণ পড়িয়া হাসিতেছিল। উজীর তাহার মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—"কেন, তুমি কি এ বাগানের রক্ষক?"

বালক। আমি রক্ষক হইতে যাইব কেন, রাজা রক্ষক! আমি মালিক।

উজীর। কে তোমাকে মালিক করিয়াছে?

বালক। সে কথা তোমাকে বলিতে যাইব কেন?

উজীর ক্ষুদ্র বালকটার বেয়াদবীতে এবারে বড়ই রুষ্ট হইলেন। তিনি সুলতান ওস্মানের পিতামহের আমল হইতে গুজরাটে উজীরী করিয়া আসিতেছেন। স্বয়ং সুলতান পর্য্যন্ত তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না। আর আজি এই

ভিখারীবেশী বালকটা কিনা তাঁর অপমান করিল! উজীরের অভিমানে আঘাত লাগিল। তিনি ঈষৎ রুক্ষস্বরে বালককে বলিলেন—"জান তুমি, আমি কে?"

বালক। আমার জানিবার প্রয়োজন কি?

উজীর। তা হ'লে তোমার দুনিয়াতে থাকিবারই বা প্রয়োজন কি?

অস্ত্র বাহির করিয়া ক্রুদ্ধ উজীর বেয়াদব বালকের বধার্থে উদ্যত হইলেন। খিল্ খিল্ হাসিয়া, বালক দেখিতে দেখিতে যেন উদ্যান-সমীরণে মিলাইয়া গেল। উজীর চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন,—কোথায় বালক? শুধু উদ্যান ভরিয়া একটা অবিচ্ছিন্ন সোণার হাসি ঢেউ খেলিতেছে।

পুষ্পবহুল লতাকুঞ্জে, শ্যামারুণ-পত্র-শোভিত তরুতলে, মণিফুল-ভারাবনত মর্ম্মর তরুলতাশোভিত কৃত্রিম উদ্যান মধ্যস্থ সরসীতীরে—নানাস্থানে উজীর সুলতানের অন্বেষণ করিলেন। প্রতিস্থানেই সেই ক্ষুদ্র বালকের হাসির প্রতিধ্বনি তাঁহার অকৃত-কার্য্যতায় রহস্য করিয়া গেল।

(৩)

অন্বেষণ করিতে করিতে মতিমহলের এক নিভৃততম প্রকোষ্ঠে সুলতানের সন্ধান মিলিল। উজীর দেখেন, সেখানে একখানি পর্য্যঙ্কে বসিয়া, সম্মুখে একখানি চিত্র স্থাপিত করিয়া, সুলতান মর্ম্মর মুর্ত্তির ন্যায় পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছেন।

দেখিয়াই বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন। রাজার ভাগ্যমূর্ত্তিটা দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষে যেন ম্লান হইয়া গেল। সুলতানের বিবাহের অনিচ্ছার কারণ বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। কালবিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধ গাত্রাবরণ উন্মুক্ত করিলেন, এবং রাজার সঙ্গে আলাপ করিবার অবসর গ্রহণ না করিয়াই, নিঃশব্দে তৎ-পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া চিত্রখানা আবৃত করিয়া ফেলিলেন। স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সুলতান পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, উজীর। তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। তখন অবনতমস্তকে বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিলেন—

"এটী কার ছবি উজীর?"

উজীর। এই প্রথম দেখিলেন, না আর কখন দেখিয়াছেন?

ওস্‌মান একথার উত্তর দিলেন না—আবার জিজ্ঞাসিলেন--"কার ছবি?"

উজীর। কার—কোন্ কুহকিনীর তা কেমন করিয়া বলিব? ষাট বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসিয়া একবার দেখিয়াছি, ষাট বৎসর পরে আবার দেখিতেছি। সে সময় আপনার পিতামহের সঙ্গে আসিয়াছিলাম। আপনার পিতামহ বৃদ্ধ, এ ছবি দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। আমি বিংশ বর্ষীয় যুবক, উন্মত্ত হইয়াছিলাম। আপনার পিতার জীবদ্দশায় এ উত্থানের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। ষাটবৎসর এ উত্থানে আমি পদার্পণ করি নাই। আজ অশীতিবর্ষ বয়সে আপনার অন্বেষণে আবার এখানে প্রবেশ করিয়াছি।

ওস্। উজীর! বয়সের সঙ্গে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যও লোপ পাইতেছে। বৃদ্ধা বসুধার বক্ষে বুঝি এ রত্নের আর উদ্ভব হয় না।

উজীর। ভৃত্যের অনুরোধ, আপনি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান ত্যাগ করুন। অনুরোধ, আর কখনও এ চিত্রমন্দিরে প্রবেশ করিবেন না—এমন কি এ উত্থানে পদার্পণ করিবেন না। জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট হইয়া যাইবে। যে প্রজার মঙ্গলের জন্য আপনি প্রাণপাত করিতে উত্থত হইয়াছেন, সে প্রজা অচিরে পিতৃহীন হইবে।

ওস্। উজীর! আমি বিবাহ করিব।

উজীর। আপনাকে সেই অনুরোধ করিবার জন্যই অনুসন্ধান করিতেছিলাম। কিন্তু আর আমি অনুরোধ করিব না।

ওস্। কেন?

উজীর। যদি, এ মন্দিরে আর কখনও প্রবেশ করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, তাহা হইলে বিবাহ করুন। নহিলে, ভাবী সুলতানাকে অসুখী করিতে আমি আপনাকে বিবাহে অনুরোধ করিতে পারি না।

ওস্। এ অতুলনীয়া সুন্দরীর পরিচয় জানিতে আগ্রহ হয়।

উজীর। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিসর দেশে "ফেরোয়া" বংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। শুনিয়াছি, ইনি সেই ফেরোয়াবংশের শেষ রাজার রাণী। এই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াই ফেরোয়ার রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা,—আপনার পূর্ব্বপুরুষ, জন্মস্থান কায়রো হইতে এই ছবিটী সঙ্গে লইয়া আসেন।

লজ্জিত সুলতান আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; এবং উজীরের হস্তে সেই গৃহের চাবি দিয়া বলিলেন—"ইহা আপনি গ্রহণ করুন। আমার সাগ্রহ অনুরোধেও আপনি আমাকে ইহা প্রত্যর্পণ করিবেন না। আমি এক বৎসর এই চিত্রিত নয়ন কটাক্ষে

জর্জ্জরিত হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলাম। আপনি আমার বিবাহের ব্যবস্থা করুন।”

মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধ চিত্র হইতে গাত্রাবরণ উঠাইয়া লইলেন। চিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

দ্বারের বাহিরে আসিয়া, কোন অজ্ঞাত তড়িল্লতাকৃষ্টবৎ সুলতান চিত্রের প্রতি আর একবার চক্ষু ফিরাইলেন। দেখিলেন, ক্ষণামু-প্রাণিতা চিত্র-সুন্দরী ঢুলু ঢুলু চোখ দু'টীতে, যেন কত যুগের আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া, ততদুর পর্য্যন্ত তাঁহার পানে চাহিয়া আছে।

প্রেমহীন বৃদ্ধের নির্দ্দয় হস্ত কবাটরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার পুনর্দ্দর্শনাভিলাষ অপূর্ণ রাখিয়া দিল। উজীর বলিলেন—“আর কেন, আসুন পাত্রীর সন্ধান করি।”

উদ্যান হইতে বাহির হইয়া, উজীর স্বহস্তে উদ্যানদ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। স্থির করিলেন, যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিন এস্থানে আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবেন না। দ্বাররুদ্ধ করিতে যাইয়া, একবারমাত্র সেই বালকটার কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। ভাবিলেন, হয়ত বালক প্রাণভয়ে উদ্যান ছাড়িয়া পলাইয়াছে। যদি থাকে, তাহার বেয়াদবীর ফলভোগ করুক।

( ৪ )

এক বৎসর পরে শীকারপুরের নবাব পুত্রীর সহিত সুলতানের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াগেল। একদিন প্রাতঃকালে সুপ্তোত্থিত নগরবাসী দেখিল, পঞ্চশত সিপাহী সুলতানের জয়গান করিতে করিতে ভাবী-সুলতানাকে পিতৃগৃহ হইতে আনিতে চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রজার উল্লাস-কোলাহলে যেন সমস্ত সিন্ধুদেশটী ভরিয়া গেল।

সপ্তাহ পরে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। দেশ বিদেশ হইতে নবাব ওমরাও নিমন্ত্রিত হইয়া, বিবাহোৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছেন। উজীর সকলের সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত ; এমন সময়ে দূত সিন্ধুনদ পারে নবাব পুত্রীর আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ আসিল, সিন্ধুর কলেবর আজ অসম্ভব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সিন্ধুনদ চিরদিনই ভৈরব কল্লোলময়। বিশেষতঃ বসন্তের প্রারম্ভে তাহার উল্লাসটা চিরকালই কিছু বর্দ্ধিত হয়। সমস্ত শীতকাল ব্যাপিয়া যে তুষাররাশি হিমালয়-শিরে সঞ্চিত হয়, বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে সেই তুষার বিগলিত হইতে থাকে। সেই গলিত তুষারেই সিন্ধুর কলেবর পরিপুষ্ট।

সিন্ধুর অসম্ভব উল্লাসের কথা শুনিয়া, নগরবাসী সকলেই বিষম ভীত হইয়া পড়িল। উৎসবের আয়োজন ভুলিয়া, সকলেই আত্ম-রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইল। রাজা ও উজীর উভয়েই মর্ম্মাহত। বুঝিবা সিন্ধু উৎসবে যোগ দিতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় উজীর নবাব পুত্রীকে পার হইতে নিষেধ করিবার জন্য নদতীরাভিমুখে ছুটিলেন।

এদিকে সুলতানও এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া, ছদ্ম-বেশে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। নবাব-নন্দিনীর প্রত্যুদ্গমন করিতে তৃতীয় ব্যক্তি রাজধানী পরিত্যাগ করিতে সাহস করিল না।

( ৫ )

আবার সন্ধ্যা! কিন্তু অরুণে সে উল্লাস নাই। একটা জলশূন্য অলস নীলধূসর মেঘ অস্তগামী সূর্য্যের মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কেবল কতকগুলা আয়াসমুক্ত কিরণছটা বন্দিত্ব হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে মধ্যগগন অভিমুখে ছুটিয়াছে। মতিমহল বিষণ্ণ। সিন্ধুতীরস্থ গুল্মবহুল প্রান্তর, কি যেন একটা আগতপ্রায় বিপদে ভীত। বৃক্ষরাজি সন্দিগ্ধ সমীরণের উপদেশে যেন থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল।

ওপারে পঞ্চশত সৈন্যবেষ্টিত নবাব পুত্রীর তঞ্জাম। পঞ্চশত বল্লমফলক রবিকিরণ অভাবে জ্যোতিহীন। সোনার তঞ্জামটা তাহাদের মধ্যে পড়িয়া, যেন বিমলসন্নিবিষ্ট কাশপ্রান্তর মধ্যে ছিন্নমূল হৈমোৎপলের ন্যায় ভাসিয়া আছে। এপারে সুলতান জনহীন নদতীরে একাকী—আগতপ্রায়া সুলতানার ক্ষুদ্রপথাংশে ভৈরবী প্রকৃতির বাধা নিরীক্ষণ করিয়া, বিবাহের অশুভ ফলাশঙ্কী, অতি দীন ভাবে পরপারে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। একটা বিষম দুর্ব্বোধ্য অন্তর্যাতনায় তাঁহার ভ্রূযুগ অসম্ভব কুঞ্চিত।

পশ্চাৎ হইতে বিষাদরুদ্ধকণ্ঠে কে তাঁহাকে ডাকিল—"জনাব" !

সুলতান ফিরিয়া দেখেন উজীর। তাঁহারও মুখে কি যেন একটা অনমুমেয় গভীর বিষাদের কালিমা পড়িয়াছে।

ওস্। সিন্ধুর জল অসম্ভব বাড়িতেছে।

উজীর। সিন্ধুর কথা আমার মনেই নাই।

ওস্। ভয় নাই, নবাবপুত্রী উচ্চভূমিতে অবস্থিত। সেখানে জল পৌছিবে না।

উজীর। নবাবপুত্রীর কথা ভাবিবারও আমার অবসর নাই।

ওস্। কেন উজীর ?

উজীর। একটা ক্ষুদ্র বালককে দিয়া বারবার এ বৃদ্ধের অপমান করাইতেছেন কেন ?

ওস্। সেকি উজীর! আমি যে আপনাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করি। কোন বালককে দিয়া ত আপনার অপমান করি নাই!

উজীর। বেশ, তবে স্বহস্তে সেই বালকের শাস্তি দিন। আমি সুলতানের কাছে বিচারপ্রার্থী।

ওস্মান ঘটনাটা জানিতে চাহিলেন।

উজীর বলিতে লাগিলেন—"এক বৎসর পূর্ব্বে আমি আপনার অন্বেষণে যখন মতিবাগে প্রবেশ করি, তখন প্রবেশ-দ্বারে সেই বালক আমাকে বাধা দিয়াছিল। তারপর আপনারই সমক্ষে আমি মতিবাগের ফটক বন্ধ করি। আজ পথে আসিতে আসিতে দেখি, উদ্যানদ্বার কে খুলিয়া রাখিয়াছে। আমার আদেশের বিরুদ্ধে এমন কাজ কে করিল জানিবার জন্য যেমন আমি উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছি, অমনি সেই বালক কোথা হইতে আসিয়া আবার আমাকে বাধা দিল। আপনাকর্ত্তৃক আদিষ্ট ভাবিয়া আমি তার বেয়াদবীর শাস্তি দিতে সাহসী হই নাই।

সুলতান বলিলেন—"চলুন, আমি স্বহস্তেই তার শাস্তি দিয়া আসি।"

( ৬ )

শত্রুর আক্রমণ হইতে শিশুটীকে রক্ষা করিবার জন্য, নীড়স্থ পাখীটীর মত অন্ধকার দুই দিক হইতে যেন দুইটা গুরুভার পক্ষ দিয়া সমস্ত উদ্যানটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সেই অন্ধকারে উজীর ও সুলতান উভয়েই সে বালকটার সন্ধান করিতেছিলেন। উভয়েই বিফল মনোরথ, উভয়েই ক্লান্ত! উজীর বলিলেন—"প্রভু! আর বালকের শাস্তির প্রয়োজন নাই। শাস্তির এই চেষ্টাতেই আমার অপমানের যথেষ্ট প্রতিশোধ হইয়াছে।"

ওস্। আপনার অপমানে বালক আমারই অপমান করিয়াছে।

উজীর। সে বালকের পরিচয় জানিতে পারি কি?

ওস্। কখন. যাহাকে দেখি নাই, তার পরিচয় কেমন করিয়া জানিব?

নদ পার্শ্বস্থ একটা তরুকুঞ্জের অন্তরাল হইতে একটা নিশাচর পক্ষী রাজার কথায় টিট্‌কারী দিয়া উঠিল। উজীরও হাসিলেন।

উজীর। বুঝিয়াছি, আমার ভ্রম হইয়াছে—আপনি চলিয়া আসুন।

ওস্। একেবারে দৃষ্টি ভ্রম?

উজীর। দৃষ্টিভ্রমও বলিতে পারেন, মতিভ্রমও বলিতে পারেন। যেহেতু এক বৎসর এই উদ্যানে নিত্য আসিয়া যাহাকে আপনি দেখিতে পান নাই, আমি দুই দিন প্রবেশ করিতে যাইয়া দুই দিনই তৎকর্ত্তৃক বাধা পাইয়াছি।

সুলতান বুঝিলেন,—উজীর তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "উজীর, আপনার সহিত রহস্য করিতেছি না।"

পক্ষীটা কলকণ্ঠে আবার টিটকারী দিয়া উঠিল।

উজীর। আমি ভৃত্য—আপনার প্রতিকথায় প্রতিবাদ করিতে সাহস করি না। কিন্তু সে বালক বলিয়াছে—'আমি এ বাগানের মালিক, রাজা রক্ষক।'

ওস্। আপনি ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি সর্ব্বাগ্রে পক্ষীটাকে বধ করি।

উজীর সুলতানকে ফিরিবার অনুরোধ করিতে না করিতে রাজা অন্ধকারে ডুবিয়া গেলেন। তার পরেই এক করুণ চীৎকার।

সেই অন্ধকারে শব্দলক্ষ্যে উজীর রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সুলতান একটা চপলালতায় স্কন্ধ বেষ্টিত করিয়া কুঞ্জমধ্য হইতে বাহির হইতেছেন।

উজীর। কি করিলেন প্রভু!

ওস্। আপনার আক্ষেপ করিবার ত কিছুই নাই। আপনি বিচারপ্রার্থী।

উজীর। তীব্রদৃষ্টির প্রহার যাহার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হইত, তাহাকে, আপনার ন্যায় কোমল-হৃদয় নরপতি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

ওস্। শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপে পক্ষীবধ করিতে যাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছি।

উজীর। হতভাগ্য বালক!

ওস্। বালক নয় বালিকা।

দারুণ ক্ষোভে রাজার মস্তিষ্কবিকার অনুমান করিয়াও, উজীর বালকটীর মুখ দেখিতে অগ্রসর হইলেন।

পদপ্রান্তস্থ তৃণগালিচার উপরে, রজতসূত্রময় মসলিনের মত কোমল বালিকাটীকে যেন বিছাইয়া, সুলতান বলিলেন,—"দেখুন দেখি, ইহাকে আর কখন দেখিয়াছেন কিনা?"

বালিকার মুখের কাছে চক্ষু লইয়াই উজীর বলিয়া উঠিলেন,—"অভাগিনী বালক সাজিয়া পথরোধ করিয়াছিল, তা কেমন করিয়া বুঝিব।"

ওস্। তা নয়, আরও পূর্ব্বে দেখিয়াছেন।

উজীর। কবে—কোথায় ?

ওস্। আবার দেখুন।

উজীর। দেখিয়াছি—কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, স্মরণে যে আসিতেছে না সুলতান!

ওস্। আর একবার দেখুন!

জানুতে সুলতান বালিকার মস্তক রক্ষা করিলেন। দুটী হাতে মুখখানি ধরিয়া অতি ধীরে উজীরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন।

শত বজ্রের ধ্বনি সঙ্গে লইয়া বিভীষিকাময়ী প্রকৃতির বিকট হাসি সমস্ত উদ্যান প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ষাট বৎসর পূর্ব্বে যে চিত্রের সৌন্দর্য্যে উজীর উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সুলতান এক বৎসর চিত্রগৃহে আবদ্ধ ছিলেন, উজীর দেখিলেন, সেই চিত্রের স্বপ্নাবিষ্ট আদর্শ তাঁহার সম্মুখে নিপতিত রহিয়াছে।

উজীর। একি সুলতান!

ওস্। উজীর! এখনও পর্য্যন্ত বসুন্ধরা এ অমূল্যরত্ন বক্ষে ধারণ করে! কেবল ইহাকে তুলিয়া লইবার হৃদয় নাই!

উজীর। একি করিলি অভাগিনী ?

সহসা বিশাল চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, উজীরের অর্দ্ধভগ্ন হৃদয়ে

অক্ষরের তীব্র শরক্ষেপে মরণের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত বালিকা বলিয়া উঠিল,—"কি করিয়াছি!"

বালকের ন্যায় উজীর রোদন করিয়া উঠিলেন,—"মা! মা! তোর বাঁচিবার যদি কোন উপায় থাকে ত বলিয়া দে। সিন্ধুর পবিত্র সিংহাসন তোর পদরেণু লাভের অপেক্ষা করিতেছে।"

সুলতান দেখিলেন, স্বপ্নাদিষ্টবৎ বালিকার চক্ষু তাঁহার মুখে কি যেন অন্বেষণ করিতেছে।

"তোমার কি কোন অভিলাষ আছে?"

"অভিলাষ?——আছে——"

"থাকে ত বল। প্রাণ দিয়াও যদি পূরণ করিতে হয়, আমি তাও করিব।"

"অভিলাষ—জল!"

বালকের ন্যায় উৎসাহে উজীর জল আনিতে ছুটিলেন।

বালিকা বলিতে লাগিল,—ষোলবৎসর পূর্ব্বে দরিয়া আমাকে এ উদ্যানে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে। এখানে উদ্যানপালকের আশ্রয়ে আমি পালিত হইয়াছিলাম। জল যদি আমাকে দিতে চাও, সেই দরিয়া হইতে আমাকে এক গণ্ডুষ জল দান কর।

সুলতান বালিকার মস্তক ভূমিতে রাখিবার চেষ্টা করিলেন।

সে দুই বাহু দিয়া নাগপাশের মত তার গলা বেড়িয়া ধরিল। অগত্যা তাহাকে হৃদয়ে তুলিয়া সুলতান নদীতীরে অগ্রসর হইলেন।

আবার ঘনমেঘে মুহুর্মুহু বিজলী। পর্ব্বত-ভেদী শব্দে দেশটা ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল। চলিতে চলিতে উজ্জীর দেখিলেন, তুলার শৈল মাথায় করিয়া, উদ্যানটাকে চূর্ণ করিবার জন্য উন্মত্ত সিন্ধু বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। এক পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গের মাথায় সহস্র আকুল তড়িল্লতাসেবিতা এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী সুলতানকে জড়াইয়া শশাঙ্ক-বেষ্টনী কৌমুদীর মত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে।

তৎপরদিন প্রাতঃকালে নগরবাসী দেখিল, দরিয়া ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মতিমহাল মুছিয়া লইয়াছে।

পঞ্চশত সিপাহী নবাবপুত্রীকে পিতৃগৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

---

## "পোঁদাদা" !

### ( ১ )

আমাদের গ্রামের মধ্যস্থলে ৺কালীস্থান, কালীস্থানের পার্শ্বে একটী সরোবর। সেই সরোবর হইতে রসী খানেক দূরে এক জীর্ণ পুরাতন শিবমন্দিরের পার্শ্বে, একখানি সুনির্ম্মিত কুটীর মধ্যে গ্রামের "পোদাদা" বহুকাল হইতে "বহাল তবিয়তে" বসবাস করিয়া আসিতেছেন। 'পোদাদার' কথাটা এখন অনেকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইবারই সম্ভাবনা। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যে কথাটা অভিধান হইতে একরূপ উঠিতেই চলিয়াছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, মহামারী, সবার উপর দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষের কৃপায় গ্রাম সকল উৎসন্ন প্রায়। বাঙ্গালীর সংসারে 'বড় জোর ঠাকুরদাদাই এখন সম্পর্কের সীমা। তাঁর পিতার অস্তিত্ব এখন কয়জন কল্পনায় আনিতে পারেন? ত্রিশবৎসর পূর্ব্বেও আমরা বহুগৃহে পাঁচপুরুষের অবস্থান দেখিয়াছি, তখনও বহুপুত্রকানারী সমাজমধ্যে দেবীরূপে পূজনীয়া। কাকবন্ধ্যা বা বন্ধ্যার তখনও পর্য্যন্ত সমাজে এত আদর হয় নাই। তখনও গৃহস্থের একটির অধিক সন্তান হইলে, প্রতি রজনীতে তাহার

সুষুপ্তি-বিজড়িত মস্তিষ্কের পার্শ্বে বসিয়া দারিদ্র্য আপনার কঠোর নির্ম্মমমূর্ত্তির বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিতে সাহস করিত না। সুতরাং সে সময় পিতামহ প্রপিতামহ এমন কি কোন কোন সংসারে অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ তাঁহাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদির কলকোলা-হলের মধ্যে বসিয়া আপনাদের তপঃক্লিষ্ট দেহকে সুস্নাত করিতেন।

আমাদের সে দিন গিয়াছে কালের প্রবাহে বাঙ্গালীর মধুরতাময় সংসারের মধ্য হইতে প্রদাদা বা পো'দাদা সর্ব্বত্রই ভাসিয়া চলিতে-ছেন। যে গৃহে এখনও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সে গৃহ ধন্য!

আমরা কিন্তু যে পোদাদার কথা বলিব, তাঁহার সংসারে কেহই ছিল না। কখন যে ছিল তাহাও জানিবার উপায় ছিল না। যাঁহারা বলিতে পারিতেন, সেই 'যোগেনান্তে তনুত্যজাং' সাধুগণের মধ্যে যিনি শেষ সাধু, তিনিও অল্পদিন হইল ধরাধাম ত্যাগ করিয়া-ছেন। সে সময় গ্রামে আমাদের মত প্রত্নতত্ত্বান্বেষী কেহ ছিল না বলিয়া, পোদাদার সংসারের সংবাদটা এতকাল অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। পোদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মৃদু হাস্যে পাঁচটা মনোরম গল্পে কথাটা উড়াইয়া দিতেন। কখন কখন বলিতেন, তোরাইত আমার সংসার, আমার সংসারে বাস করিয়াও এতদিন সেটাকে দেখিতে পাইলি না!

বাস্তবিক গ্রামই এখন তাঁর সংসার হইয়াছিল। তিনি গ্রামবাসী সকলেরই পোদাদা। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, পুত্র, পিতা, পিতামহ সকলেই তাঁহাকে এই সম্মানের আখ্যায় অভিহিত করিত। এক ক্রোশব্যাপী ভদ্রাসনের মধ্যে অসংখ্য নাতি প্র-নাতি পরিবৃত "পোদাদা" স্নিগ্ধ ছায়াময় উদার আশীষ-আবরণ লইয়া একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেন। গ্রামে একটি বাজার ছিল, প্রতিদিন তাহা হইতেই তাঁহার অন্নের সংস্থান হইত। পুরুষ, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই শক্তি ও সময়ানুযায়ী কার্য্য করিয়া পোদাদার সেবা করিয়া যাইতেন। আমরা বালকেরা প্রায়ই তাহার কোন বা কোন একটা কাজ করিতে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করিতাম। মুখুয্যেদের বাড়ীর অশীতিবর্ষীয়া ঠানদিদি আসিয়া তাঁহার পাক কার্য্য সমাধা করিতেন। তিনি কেবল সর্ব্বদা গড়গড়ায়মান হুঁকার সাহায্যে স্বগৃহে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেন।

'পোদাদা' বলিলে, কেহ যেন তাঁহাকে অবিরাম কাশী সমন্বিত অস্পষ্ট বাক্যাধার একটি গতিশক্তিহীন জড়পিণ্ড মনে না করেন। প্রতি প্রভাতে, যষ্ঠিতে ভর দিয়া, দেবীস্তব সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে করিতে পোদাদা ভাগীরথীতে স্নান করিতে যাইতেন। স্নান করিয়া প্রতিদিন তিনি একরূপ গ্রামটাকে প্রদক্ষিণ করিতেন। যেখানে

ক্রিয়া কার্য্যোপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হইত, সেইখানেই সর্ব্ব পরিচিত থেলো হুঁকাটী হাতে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণশীল পোদাদাকে আমরা যজ্ঞরক্ষী দেবতার ন্যায় দেখিতে পাইতাম। রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে, ঔষধ পত্রের বিধান দিতে, তাঁহাকে এক আধ বার সকল গ্রামবাসীর গৃহেই পদার্পণ করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ, যেখানে মুমুর্ষুকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার প্রয়োজন হইত, সেখানে নাড়ী পরীক্ষার জন্য পোদাদার আগমন অবশ্যম্ভাবী। অন্তিমকালে দেবদর্শনের ন্যায়, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, কত বৃদ্ধ আপনাদিগকে পরলোকের পথিক হইবার উপযোগী করিয়া লইত।

পোদাদার কি নাম ছিল না? আমাদের বালক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া অনেকদিন অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল; কিন্তু কোনও দিন তর্কের মীমাংসা হইত না। তাঁহার গলায় পৈতার গোছাটা, আমাদিগের গুরুজনের তৎপ্রতি ভক্তি, এবং মধ্যে মধ্যে তৎগৃহে প্রাপ্ত আমাদিগের শ্রদ্ধায় সেবনীয় তাঁহার হবিষ্যান্নের প্রসাদ তাঁহার পবিত্র ব্রাহ্মণত্বের সাক্ষী প্রদান করিত। কিন্তু তাঁহার নাম কি, তাঁহার কেহ কোথায় আছে কি ছিল, জানিবার কোনই উপায় হইত না। শ্রদ্ধেয় গুরুজনের নাম

জিজ্ঞাসা সে সময়ে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইজন্য আমা-দিগের গুরুজন এই বৃদ্ধের নাম আবিষ্কারের কথা মনেও আনিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু আমরা তখন অল্পে অল্পে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছি; বিশেষতঃ পোদাদার জীবনের একটা ইতিহাস রাখিবার জন্য আমরা বড়ই ব্যগ্র, এইজন্য সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নাম জানিবার জন্য, আমরা বহু সুযোগ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।

এই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল কতকগুলি ফলিয়াছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহার পিতামাতার ও মাতুলের অস্তিত্বের আভাষ পাইয়াছিলাম। তিনি অন্যমনস্কে একদিন বলিয়া ফেলেন, আমি কুলীনের সন্তান, সুতরাং বাল্যে মাতুল গৃহেই প্রতিপালিত হই। বাল্যকালে আমি বড়ই দুষ্ট ছিলাম। সেই দুষ্টামীর শেষ ফল বিলুপ্ত করিতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত কালের প্রভাব আমার শরীরের উপর দিয়া অবিরাম চলাচল করিয়াছিল। তথাপি সম্যক্ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। সেই বয়সেই মাতুলের উপর ক্রোধ করিয়া একদিন তাঁহার একটী সযত্ন রোপিত আম্রশিশু সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলি। ক্রুদ্ধ মাতুল, সেইজন্য তিরস্কার ছলে, আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—“এত লোকের মৃত্যু হইল,

গ্রামের যেখানে যা ভাল ছিল সব গেল, তবু এই আঁটকুড়ীর নন্দনের মৃত্যু হইল না।”

ইহাতেই আমরা অনুমান করিয়াছিলাম, কোন একটা বিস্মৃতি-গর্ভ অন্ধকারময় পূর্ব্বযুগে পোদাদার আঁটকুড়ীজাতীয়া পুত্রবতী এক জননী ছিলেন। এবং পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ এই ন্যায় সূত্রানুসারে অনুমিত, পোদাদার একজন পিতৃপুরুষের অস্তিত্বও সেই সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

আর একদিন তাঁহার আর একটু পরিচয় পাইবার শুভ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। সে দিন আমাদের প্রতিবাসী বৃদ্ধ গদাধর চাটুয্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। আমরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। পোদাদাকে অবশ্যই এমন শুভকার্য্যে মৃত গদাধরের গৃহে পদধূলি দিয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিকে উৎসাহিত করিতে হইয়াছিল। সে সময় বর্ষাকাল, পল্লীগ্রামের পথ বর্ষায় কিরূপ দুর্গম হয়, তাহা পল্লীবাসীর কাহারও অবিদিত নাই।

ব্রাহ্মণভোজন নিষ্পন্ন হইবার পর, পোদাদা আমাকে বলিল, “হরিচরণ! পথটা বড়ই দুর্গম হইয়াছে। তুমি আমাকে বাড়ীতে দিয়া আইস।”

আমি তদ্দণ্ডেই এই পবিত্র ভার গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ

করিলাম। তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র, মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া, আমাকে পোদাদার গৃহে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধ আমার অবস্থা বুঝিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আজ না হয়, নাতবৌকে, আকাশ পাতাল চিন্তার আয়ত্তে আনিতে, এমন ঘন বর্ষায় একাকিনী রাখিয়া এই বৃদ্ধের গৃহেই রাত্রিটা অবস্থান করিলে! বর্ষার রাত্রিটা কি শুধু নবীন নবীনার তৃপ্তিসাধনের জন্য—বৃদ্ধের নয়?"

আমি লজ্জিত হইয়া সম্মতি দিলাম। নিবিড় জলদতাড়িত অন্ধকার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গ্রামটাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বর্ষার অন্ধকারে সর্পের ভয়; আমি পোদাদার অনুরোধে সে রাত্রির মত সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলাম। গদাধর চাটুয্যের বাড়ীর ভৃত্য পোদাদার জন্য ক্ষীর ও মিষ্টান্ন আনিয়া উপস্থিত করিল, পোদাদা তাহাকে দিয়াই আমার বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন, এবং আমাকে বলিলেন—"অপরাহ্নে নিমন্ত্রণ খাইয়াছ, আমার বোধ হয়, রাত্রে তোমার জন্য আহারের প্রয়োজন হইবে না। যথেষ্ট মিষ্টান্ন, ইহাতেই উভয়ের পর্য্যাপ্ত জলযোগ হইবে।

* * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পোদাদা সন্ধ্যা করিতে তাঁহার

নির্দ্দিষ্ট আসনে কিয়ৎক্ষণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন। বৃষ্টিও রাত্রির সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পোদাদার ক্ষুদ্র কুটীরটীকে বেষ্টিত করিয়া একটি অনতিবৃহৎ আম্রকানন; তাহার পরেই একটি ধান্যক্ষেত্র। সেই জলপূর্ণ ধান্যক্ষেত্রে লীলানিরত ভেকের স্বর দিগন্তাগত পার্ব্বত্য-প্রস্রবনের শব্দ-স্রোতের মত বর্ষার ধারাবর্ষণ শব্দে অবিরাম মিলিত হইতেছিল। আমি নীরব-স্তিমিতলোচন-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সমক্ষে মুখর ঘনান্ধকারে যেন কিয়ৎক্ষণের জন্য ডুবিয়া রহিলাম। অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার! নীরবে বসিয়া বসিয়া সেই স্বল্পপ্রভ দীপালোকিত গৃহে আমি যেন জীবনে প্রথম অন্ধকারের একটা মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ধ্যানস্তিমিতলোচন ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে আসিয়া প্রণত হইল। ভয়বিস্ময়ে আমার চক্ষু নিমীলিত হইল।

*　　*　　*　　*

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। সহসা এক গগনভেদী শব্দে আমার সংজ্ঞা ফিরিল। চাহিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ তখনও পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্ন।

ভয়ে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিলাম।—"দাদা! দাদা!"

ব্রাহ্মণ চোখ না মেলিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"ত্রিলোচন,

ত্রিলোচন !" আমি তাঁহার গা ঠেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "দাদা ! দাদা !"

দাদা চক্ষু মেলিলেন আমার দিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন—বোধ হইল, যেন কোন অজ্ঞাতদেশে প্রস্থিত আত্মাকে ধীরে ধীরে দেহরূপ ক্ষুদ্র কুটীরে ফিরাইয়া আনিতেছেন।

"একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া দেখিতেছেন কি ?"

"কে তুমি, হরিচরণ ?"

"কেন, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না !"

"ত্রিলোচন আসিয়া ছিল না ?"

"ত্রিলোচন কে ?"

ব্রাহ্মণ আবার কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইলেন। আমি বুঝিলাম, এই অনৈতিহাসিক যুগের বৃদ্ধের সঙ্গে রাত্রিবাস করিতে আসিয়া কাজ ভাল করি নাই।

ক্ষণেক পরে ব্রাহ্মণ যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই রাত্রি কত ?"

"কেমন করিয়া বলিব !"

ব্রাহ্মণ নাসিকায় অঙ্গুলি দিয়া, একবার বাম নাসিকায়, একবার দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তার পর বলিলেন—

"ইস্! এতক্ষণ আমি তোমাকে নাতবৌএর চিন্তায় জর্জ্জরিত করিয়াছি!"

"আপনার নাতবৌ এখন কিছুকাল মস্তিষ্কে স্থান পাইবে না।"

"কেন দাদা?"

"ভয় আসিয়া সমস্ত মস্তিষ্কটা দখল করিয়াছে। দাদা চিন্তা-স্রোতে এখন বন্যার আবির্ভাব। আপনার নাতবৌ তাহাতে পড়িয়া কি জন্মের মত ভাসিয়া যাইবে?"

"আমি যেখানে আছি, সেখানে কিসের ভয়?"

"আপনিই বা ছিলেন কই?"

"ভয় পাইলে ত আমায় তুলিলে না কেন?"

"আমিও কি ছিলাম! আমিও আপনার মত ধ্যানমগ্ন হইয়া-ছিলাম। একটা ভীষণ শব্দে বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়াছে।"

সমস্ত কথা তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। শুনিয়া দাদা হাসিলেন। আবার বলিলেন ইংরাজী পড়িয়া ভূত প্রেত ত মাননা; কিন্তু ভয়টি ত ত্যাগ করিতে পার নাই।"

"চক্ষে দেখিলাম, ভয় না করিয়া কি করিব!"

"রাত্রি দ্বিপ্রহর, কিছু জলযোগ কর।"

"জলযোগ এখন কয়দিন বন্ধ তার ঠিক কি! ব্যাপারটা কি

বুঝিতে না পারিলে, উদরে কিছুই প্রবেশ করিতেছে না।—দাদা! কি দেখিলাম?"

"যা দেখিয়াছ, তাহা সত্য। ত্রিলোচন আসিয়াছিল।"

"ত্রিলোচন কে?"

"ত্রিলোচন গদাধরের বাল্য-সঙ্গী। আমার একমাত্র পুত্র।

"আপনার পুত্র! কই তাহাকে ত কখন দেখি নাই!"

"কেমন করিয়া দেখিবে। ত্রিলোচন প্রায় সপ্ততিবর্ষ ইহজগতে নাই।

বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া আমি বৃদ্ধের মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম। মনে করিলাম, ত্রিলোচনের বিষয় জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কাজ ভাল করি নাই। এই স্বজন বান্ধবহীন বৃদ্ধের পূর্ব্বজীবনের সুখের সংসারের একটা ক্ষণস্থায়ী আলোকময় চিত্র তুলিয়া, তাঁহার জীবনটাকে বুঝি আজকার রাত্রির অন্ধকার হইতেও অধিকতর অন্ধকারময় করিয়া তুলিলাম! তাঁহার চিন্তার স্রোত ফিরাইবার ইচ্ছায় বলিলাম—"রাত্রি অধিক হইয়াছে; আপনি একটু জলযোগ করিয়া লউন।"

"আমার আজ আর জলযোগ হইবে না। আমি পুত্রের

অভাব আবার নূতন করিয়া অনুভব করিলাম। বুঝি ত্রিলোচন আর এখানে আসিবে না।"

"এতদিন কি আসিত ?"

"প্রতিদিন—প্রতিদিন বালক সেবার অভিলাষে আমাকে একবার করিয়া দেখিয়া যাইত।" বুঝিলাম পুত্রশোক নূতন হইয়া বৃদ্ধকে কাতর করিল। ইহাও বুঝিলাম, ত্রিলোচন বাল্যেই দেহত্যাগ করিয়াছে। তাঁহাকে কতকটা আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম—"ভালই হইল ত দাদামহাশয়! আপনার ত্রিলোচন ত প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল! দাদামহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বসিলেন—"ভাইজী! দেখিতেছি তুমি প্রেতত্বে বিশ্বাস কর!" ধরণীতে বালক নিষ্পাপ জীবন বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। তবে কেন যে সে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই জানিত।

আমি। বোধ হয় তার পিতৃভক্তি।

আমার কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া দাদা বলিলেন—"দেখ দেখি ঘরের মধ্যে আমার শয্যার পাশের দেওয়ালে কোন ছবি আছে কিনা।"

আমি প্রদীপ হাতে লইয়া গৃহে প্রবৃষ্ট হইলাম। নির্দ্দিষ্ট দেওয়ালের গায়ে ছবির অনুসন্ধান করিলাম। একি! সুন্দর

রমণীর প্রতিমূর্ত্তি! নিশ্চল বিশাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি—ধ্যানমগ্না যোগিনীর ন্যায় সুন্দরী বদ্ধকরপুটে যেন কোন পরিদৃশ্যমান দেবতার দিকে কৃপাভিক্ষার্থিনী হইয়া চাহিয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া আমি ছবির পানে চাহিয়া রহিলাম। ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া পো'দাদা বলিলেন—"কিহে দেখিতে পাইলেনা?"

"পাইয়াছি।"

"কি?"

"রমণী।"

"তাহার পার্শ্বে?"

"কই কিছুই নাই।"

"তবে চলিয়া আইস।" আমি বাহিরে আসিলে বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, "বেশ ভাই, বেশ বলিয়াছ। আমিই যদি তার বন্ধনের কারণ, তাহা হইলে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুত্র আমার এতদিন পরে মুক্তি লাভ করিল।" ছবিতে যে রমণীর চিত্র দেখিতেছ, ওইটীই তোমার পো'দাদার অতীতজীবনে সুখদুঃখের অংশভাগিনী—তোমাদের গ্রামস্থ সকলের অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহী। আমি সে সময়ও প্রায় এইরূপই বৃদ্ধ। সপ্ততি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে, তোমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া

গিয়াছেন। এই সপ্ততি বর্ষেও আমার জীর্ণ দেহের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কেন না এতদিন লোকচক্ষে পুত্র কলত্রহীন হইয়াও বস্তুতঃ তাহাদের অস্তিত্বে আমি সংসারীর ন্যায় বাস করিতেছিলাম। ওই ছবির পার্শ্বে আমার পুত্রের ছবি ছিল। আজ তাহা অদৃশ্য হইয়াছে।"

কথাটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও, আমি আর একবার দাদার পুত্রের প্রতিকৃতির অনুসন্ধানে গৃহমধ্যে প্রবৃষ্ট হইলাম। দাদা আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "বৃথা চেষ্টা—আর সে ছবির সন্ধান পাইবে না।"

তথাপি আমি ঘরের মেজের চারিদিক অনুসন্ধান করিলাম। ভাবিলাম যদি কোনও উপায়ে হারাণো ছবির সন্ধান করিয়া পুত্র-বিয়োগ কাতর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে পারি।

"এই যে পাইয়াছি দাদা!"

"সত্য!"

"পাইয়াছি। কিন্তু ছবি কোনও কারণে দেওয়াল হইতে পড়িয়া দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে।"

মনে করিলাম, খণ্ড দুইটি পরস্পরে জুড়িয়া পো'দাদার কাছে লইয়া যাই। এই ভাবিয়া দুইস্থান হইতে ছবির ভগ্নাংশ দুইটি

সংগ্রহ করিলাম। যেমন দুইটি জুড়িতে যাইতেছি, অমনি কোথা হইতে কে আমার হাত দুইটি সবলে চাপিয়া ধরিল। মাথা তুলিয়া দেখি—সে দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না—একটি পরম সুন্দর বালকের হাত ধরিয়া ঠিক যেন পরলোকগত বৃদ্ধ গদাধর। নবীন নবনীতোপম অঙ্গ লইয়া বালক মধুময় দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়াছিল; কিন্তু গদাধরের কি ভীষণ কোটরগত রোষরঞ্জিত চক্ষু! তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণের ব্যাধি-বিকৃত চক্ষু আমি দেখিয়াছিলাম। সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, হাত হইতে ছবির অংশ দুইটী খসিয়া পড়িল।

দাদা! দাদা!

"ত্রিলোচন! গদাধর!" কেবল দুটি কথা আমার কানে গিয়াছিল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

---

# প্রায়শ্চিত্ত।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### প্রস্তাবনা।

শম্ভুর সহধর্ম্মিণী সুশীলা সুন্দরী স্বামীর প্রতি সকোপ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন। শম্ভু একবারমাত্র মাথা তুলিয়া, স্ত্রীর নয়নে নয়ন রাখিয়া, মাথার সঙ্গে সে দুটীকে আবার নামাইয়া লইয়াছেন।

স্বামীর ঈদৃশ ব্যবহারে আরও কিছু কুপিত হইয়া সুশীলা সুন্দরী চোখের কোন হইতে কতকটা রোষ রাঙা ঠোঁট দু'খানিতে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। রোষভরে ঠোঁট দু'খানি আপনা আপনি নড়িয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া কতকগুলা কথা সেই অধরোষ্ঠের অন্তরালে ডিবেটিং ক্লব খুলিয়া লাফালাফি করিতেছিল। কখন বা টেবিল বোধে সুশীলা সুন্দরীর বক্ষে ঘা মারিতেছিল। প্রহার তাড়নে কোমলার কোমল বক্ষের নিশ্বাসগুলা বেগে

নাসিকা পথ দিয়া পলাইতেছিল। অধরোষ্ঠের ঈষৎ কম্পনে অবকাশ পাইয়া বাতাস খাইবার জন্য বদনকূপ হইতে দু দশটা কথা বাহিরে আসিয়া পড়িল। সুশীলাও শান্ত হইলেন, শম্ভুও নিশ্চিন্ত হইলেন।

শম্ভুর নিশ্চিন্ত হইবার কারণ ছিল। ক্রিকেটের আউটবলের মতন সুশীলার কথা মাঝে মাঝে গণ্ডী ছাড়াইয়া শম্ভুকে গুরুতর আঘাত করিত। আজকে বল্‌টা মগ ঘেঁসিয়া কানের কাছ দিয়া ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তাই শম্ভু নিশ্চিন্ত হইলেন।

সুশীলা আজ স্বামীকে তিরস্কার করিতে গিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া দু'টা কাঁদুনি গাহিলেন। এ কাঁদুনিতে তীব্রতার পরিবর্ত্তে একটু আবেশ মিশ্রিত ছিল। স্বামী যদি নিজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিল না, সন্তান সন্ততির মুখ চাহিল না, দু'পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া পাঁচজনের মধ্যে একজন হইতে পারিল না—কেবল বসিয়া বসিয়া কাগজে কলম পিসিয়া, বঙ্গভাষারূপ মাকাল ফলের চাষের জন্য অমূল্য সময় জমিতে মস্তিষ্কের সার ঢালিয়া সকল আশায় জলাঞ্জলি দিল, তখন স্ত্রীর আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি! ওকালতি পাশকরা উর্ব্বরা জীবন-জমিতে আবাদ করিতে জানিলে সোনা ফলিতে পারিত। স্বামীর কৃষিকাজ এসেনা বলিয়া তাহাতে

হল্‌দে হল্‌দে ফুল মাথায় করিয়া কতকগুলা শেয়ালকাঁটার গাছ জন্মিয়াছে।

কথাবেগ সংযত করিয়া, কি জানি কি বুঝিয়া সুশীলা সুন্দরী স্বামীকে তিরস্কার করিতে যাইয়া সহসা নিবৃত্ত হইলেন। ভিতর হইতে সংবাদ আসিল, জামাই বাবুর 'ঠাঁই' হইয়াছে! নির্ব্বাক শম্ভু মুদিত নয়নে যেন যোগাবলম্বনে সেই ঠাঁইলোকে চলিয়া গেলেন।

সুশীলাও স্বামীর অনুসরণ করিলেন। যেন জলের পিছু পিছু তৃষ্ণা চলিল। ঘড়ীও অবকাশে, দীর্ঘশ্বাসের মত যে কটা বাজিবার সব বাজিয়া নিরস্ত হইল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### প্রত্নতত্ত্ব।

শম্ভু চলিয়া যাক্। এই অবসরে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যতটা পারি অনুসন্ধান করিয়া ফেলি।

শম্ভুর অতিবৃদ্ধ পিতামহ একজন অতি প্রসিদ্ধ জমীদার ছিলেন। অত্যন্ত-বৃদ্ধ প্রপিতামহ অর্থাৎ প্রপিতামহের বাপ রামতনু মজুমদার ঢাকা কিম্বা মুরশিদাবাদ, অথবা হিজলি কাঁথি—একান্ত না হয় গৌড়,

গৌহাটি, গাড়লপুর—কোন এক দেশের নবাবের উজীর অথবা রাজার মন্ত্রী ছিলেন। এককালে তাঁর ভয়ে বাঘে গরুতে জল খাইত। তাঁহার বাসস্থান বঙ্গ বিহার কিম্বা উড়িষ্যা, কিম্বা মণিপুর নাগপুর অথবা বাঘেরহাট বাগবাজারের কোন এক স্থানে ছিল। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে দুই কিম্বা দশদিনে, কিম্বা শত বৎসর পরে, রাজতরঙ্গিনী, চাঁদবর্‌দই, রাসমালা হইতেই হউক, কিম্বা সায়র মুতাক্ষরীণ, সখীসংবাদ, শিশুশিক্ষা হইতেই হউক, তাঁহারা রামতনুরূপ লুপ্তমণি বাহির করিবেনই করিবেন। রামতনু আর লুকাইতে পারিতেছেন না। কোন কোন তত্ত্বদর্শী গভীর গবেষণাপ্রমুখ অনুসন্ধান-হলচালনে রামতনুরূপ প্রস্তর ফলক তুলিবার আশা রাখেন। যখন কেহ কিছু করিতে পারিবেন না, তখন—"কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন পূর্ব্বসূরিভিঃ মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব" আমাদের গতি কি করে বলা যায় না।

আপাততঃ এইমাত্র বলিয়া রাখিতে পারি যে, "যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী। রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তর কোশলা।" সুতরাং রামতনু নন্দন, অর্থাৎ, শম্ভু বাবুর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের জমীদারী কোথায় গিয়াছে কে বলিতে পারে? জমীদারীর অন্বেষণে

সুন্দরবনে একটা প্রকাণ্ড অভিযান হইয়াছিল। কিন্তু হায়! মধুমক্ষিকার দংশনে, আর রাজকীয় বাঙ্গালী ব্যাঘ্রের তাড়নে লোকগুলা পলাইয়া আসিয়াছে!

আসল কথা এখন শম্ভুর নিজের অবস্থা বড় ভাল নয়। তবে শম্ভু সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান বোধে, এবং সদ্বংশজাত বলিয়া, এবং বি, এল পাশ করায় ভবিষ্যতে দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে ভাবিয়া, কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের কোন এক নম্বরের কপালে কেরাণী করালীচরণ কর কন্যা সুশীলাসুন্দরীকে তাঁহার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যে আশায় শম্ভুর শ্বশুর কন্যাদান করিয়াছিলেন, সে আশা বঙ্গবাসীর অদৃষ্টগগনের যুগপ্রলয়ে অম্লজান বাষ্প সংযোগে পাচনক্রিয়ায় মদে পরিণত হইয়াছিল। শ্বশুর মহাশয়ের আশায় নেশা হইয়াছিল। আশাও পুরিলনা, নেশাও ছুটিলনা। ডেপুটী-গিরি, মুন্‌সেফী, কেরাণীগিরি, মাষ্টারী—যে কোন কাজেই হউক, জামাতৃপ্রবর একদিন না একদিন লাগিবেই লাগিবে ধ্রুববিশ্বাসে, জামাতার পিতৃমাতৃকুলে কেহ নাই বলিয়া, বহুদিন ধরিয়া তিনি তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রাদপিধনভাজাংভীতি! সুতরাং এই 'নির্ব্বিশেষ' প্রতি-

পালনে ক্রমে ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা হইল। শম্ভু যে ঘরে ঢুকিয়া আর বাহির হইবেন না, মন্দভাগ্য করালীচরণ কন্যাদানের সময় সেটা বুঝিতে পারেন নাই। যখন বুঝিলেন, তখন শম্ভুর এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছে। এবং শম্ভু শুভ্রকেশসম্ভার মাথায় লইয়া কর্ণওয়ালিসের প্রান্তস্থ গৃহে ধবলাগিরির মত স্থির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সে আসন টলাইতে হইলে অচিরে পর্ব্বতপ্রমাণ ডিনামাইটের প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া, শ্বশুরমহাশয় শম্ভুর স্থান-চ্যুতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

তথাপি তিনি তাহাকে মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। বলিবার চেষ্টা করিতে করিতে, সুশীলার পুত্রকন্যা নলিন-নলিনী বড়ই তাঁহাকে মায়ায় জড়াইয়া ফেলিয়াছে। জামাতা যখন উপার্জ্জনক্ষম, তখন তাহাকে কিছু বলিলে পাছে নলিন নলিনীকে লইয়া কোন্ বিদেশে চলিয়া যায়, এই ভয়ে শ্বশুরমহাশয় জামাতাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না।

তখন তিনি 'ঝীকে মারিয়া বৌকে শিখান' নীতি অবলম্বন করিলেন। অর্থাৎ শম্ভুকে শুনাইয়া তিনি কথায় কথায় কন্যার অদৃষ্টের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন বলিতেন— "আহা! আমার এমন সোনার জামাই, ইচ্ছা করিলে লাখো-

টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে—শুধু তোর অদৃষ্টে একদিনের জন্যও তার সে শুভ ইচ্ছা হইল না! কোনদিন বলিতেন—"তোকে রাজরাণী দেখিব বলিয়া, বাছিয়া বাছিয়া রাজলক্ষণযুক্ত শম্ভুকে দান করিলাম, শম্ভুর রাজভাগ্য ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তোর ভাগ্য ফুটিল না। তুই বাপের বাড়ীর যে ঝী, সেই ঝীই রহিয়া গেলি।" কোনদিন হয়ত পতিতিরস্কাররতা কন্যার পার্শ্বগত জামাতার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া একটু আবেগভরে বলিতেন—"শম্ভুবাবুর অপরাধ কি! স্ত্রীভাগ্যে ধন, আর স্বামিভাগ্যে পুত্র। শম্ভুবাবুর কার্য্য শম্ভুবাবু করিয়াছে। তোর অদৃষ্টে ধন নাই, ত সে কি করিবে?"

দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস আসিল, বৎসরের পর বৎসর দেখা দিল। শ্বশুর তাঁহার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ দেখিয়া নিরস্ত হইলেন। সুতরাং সুশীলা নিজেই স্বামিপ্রবোধন ব্রত ধারণ করিলেন। প্রথমে ব্যাজস্তুতি, অর্থাৎ নিন্দাছলে স্তুতি, ও স্তুতিছলে নিন্দা—অন্নদা ভবানন্দভবনে যাত্রাকালে পাটনীর কাছে শিবসম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাজস্তুতি—অন্নব্যঞ্জনের পাত্রের সঙ্গে ফলদক্ষিণাস্বরূপে স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। 'কোন গুণ নাই', 'কপালে আগুন', নির্লজ্জ—প্রভৃতি

যতকিছু বিশেষণ শম্ভুসম্বন্ধে প্রযুজ্য হইত, শম্ভু মুদিত নয়নে সেগুলি আহারান্তে আচমনের সঙ্গে গলাধঃকৃত করিয়া ফেলিতেন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানটা শম্ভুর বিশেষরূপ জানা ছিল। তিনি জানিতেন, আধুনিক চিকিৎসকগণের মত এই যে, আহারান্তে কিঞ্চিৎ পক্কফল খাইলে আর অম্লরোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না।

কিন্তু যখন সুশীলা স্তুতিনিন্দাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ডিগবাজী খাওয়াইয়া উপদেশটাকে খিচুড়ীর আকারে পরিণত করিয়া, ঈষদুষ্ণভাবে স্বামীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন, তখন শম্ভু বুঝিলেন উপার্জ্জন না করিলে আর চলে না।

এতকালের মধ্যে শম্ভু কি একবারও উপার্জ্জনের চেষ্ট করেন নাই? করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহ-জামাতার আসনের অযোগ্য বলিয়া, তাহার ডেপুটীত্ব পছন্দ হইল না। মুখ নাই বলিয়া উকীল হওয়া হইল না। গাধা ন'ন বলিয়া তিনি মুন্সেফ হইতে পারিলেন না। ক্রমে এটা ওটা সেটা না হইতে শম্ভুবাবুর কিছুই হওয়া হইল না। ঘরের ধন শম্ভু আবার ঘরে ফিরিলেন। শম্ভুর ইংরাজীবিদ্যা শম্ভুকে ছলনা করিল। কাল্পনিক উন্নতির গোলকধাঁধায় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, নাক কান মলাইয়া—আর চাকুরীর জন্য বাহির হইব না প্রতিজ্ঞা করাইয়া ঘরের শম্ভুকে আবার

ঘরে পাঠাইয়া দিল। শম্ভু শ্বশুরভবনে স্থির গম্ভীর অচল অটল। "শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ।" তবে কে সাহস করিয়া শম্ভুকে শ্বশুর-ভবনের আসনচ্যুত করিবে?

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### প্রতিধ্বনি।

শম্ভু একদিন এইরূপ স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার এক বাল্যবন্ধু তাঁহারই মতন স্বাধীন জীবনের চিরাভিলাষী, অথচ অর্থোপার্জ্জনের মহাজনপ্রশস্ত যে ক'টা পথ আছে, সেই পথের যে কোন একটা দিয়া চলিতে অক্ষম—সুতরাং শম্ভুরই মতন অবস্থাপন্ন, কিন্তু তাহার মতন শ্বশুর জুটে নাই বলিয়া ভবঘুরে বাল্যবন্ধু তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শম্ভু তাহার কাছে শুনিলেন, বাঙ্গালী বাংলা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের সহপাঠী বয়াটে বামাচরণ বাংলায় কলম ধরিয়া বারমাসের মধ্যেই "বাহাদুর" বনিয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশ চ্যান্সেলর হইতে আরম্ভ করিয়া বটতলার বাজে বেয়ারা পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা বঙ্গভাষা করিয়া চীৎকার করিতেছে। সে চীৎকারে, কবির ত

কথাই নাই, কাক কোকিল কেরাণী কুলি প্রতিধ্বনি দিতেছে। এমন কি সে গগনভেদী প্রতিধ্বনিতে—বাংলার কথা ত ধরাই উচিত নয়—যোধপুর, জয়পুর, জলপাইগুড়ি—এমন কি জর্ম্মাণী পর্য্যন্ত যোগ দিয়াছে।

শুনিবামাত্র শম্ভু বগল বাজাইলেন। শম্ভুর বাল্যবন্ধুও সেই বগল-বাদ্যে বগল-প্রতিধ্বনি তুলিলেন। তখন বগল-কবলিত সমীরণ পটাপট শব্দে অনন্তগগন ভেদ করিয়া অনন্তের দিকে ছুটিল। অনন্ত দূর-সংস্থ-সিংহাসন শোভাকরী অদৃষ্টসুন্দরী সেই শব্দ শ্রবণে মূর্চ্ছিতা হইলেন। বুঝিলাম শম্ভুর উপর তাঁর অধিকার লোপ পাইল। অদৃষ্ট কি? মানবের উন্নতি অবনতি বিষয়ে তাহার সম্পর্ক কি? ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ মানব পুরুষকাররূপ ব্রহ্মাস্ত্রের মালিক হইয়াও এতকাল কেবল অদৃষ্টনিবদ্ধ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। এখন ধর পুরুষকার, হান পুরুষকার। কেবলমাত্র পুরুষকারের জয় ঘোষণা কর।

তখন যে ভাষার মাতা নাই পিতা নাই—অথবা মাতা পিতা থাকিলেও তাহারা ভাষার উপর মাতৃপিতৃত্বের দাওয়া করিতে পারে না—কিন্তু স্বয়ম্ভূর ন্যায় বিশাল দেহ লইয়া সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর—সেই ভাষায় শম্ভু শ্রীশ্রী৺কালীমাতার আশী-

ফাঁদে ব্যবসায় চালাইবার সঙ্কল্প করিলেন। যে ভাষায় শিষ্য গুরুকে মন্ত্র প্রদান করে, ছাত্র শিক্ষকের কার্য্য সমালোচনা করে, সেই ভাষায় শম্ভু বেদব্যাস হইবার জন্য গণেশ খুঁজিতে লাগিলেন। যে ভাষায় এরণ্ডবৃক্ষ হইতে বিদ্যামন্দিরের কবাট প্রস্তুত হয়, রসালে তেল হয়, জলে হৃদয় পুড়িয়া ক্ষার হয়, অনলে অঙ্গ জল হইয়া, সহস্রধারায় বন্যার স্রোতস্বিনীর মত নানা মানসরাজ্য ভাসাইয়া হতাশাসাগরে পড়িয়া নিবৃত্ত হয়, শম্ভু সেই ভাষা-তরঙ্গিনীতে ঝাঁপ খাইবার জন্য কোমরে কল্পনারূপ গামছা বাঁধিলেন। যে ভাষায়, কবি-কল্পনার গুটীকতক বাছা বাছা কথা আছে,—তাহারাই যাজক, তাহারাই যজমান, তাহারাই যজ্ঞের হবি, আবার তাহারাই ঋষি-ছন্দ দেবদেবী—শম্ভু এহেন ভাষাযজ্ঞে কল্পনাব্রতে ব্রতী হইলেন।

তবে আর বাকি রহিল কি? লবণ লৈবু সব হইল, বাকি রহিল কি? বাকি রহিল আমাদের মাথা ও মুণ্ড।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### প্রণয়।

কল্পনাতাড়নে বহুকালের পর শম্ভু একবার ছাদে উঠিলেন। ছাদে উঠিয়া দেখিলেন, শকট-চক্রধ্বনিকুহরিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা মাথায় লইয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—হেমন্তের হিমকণা-বরণা নীথরতরঙ্গিনীর মত অট্টালিকাশোভিত কূলমধ্যদিয়া—সূক্ষ্ম হইতে প্রশস্ত হইয়া, কোন্ দিগন্ত হইতে আসিয়া, আবার প্রশস্ত হইতে সূক্ষ্ম হইয়া কোন্ দিগন্তে চলিয়া যাইতেছে। তটিনীস্রোতে গা ভাসান দিয়া চলিয়াছে, পানসীরূপী হাওয়ার গাড়ী, আর হোরমিলারের "উর্ম্মিলারূপী" ট্রামকার; আর জেলেডিঙ্গীরূপী ছেকড়া, ও লঞ্চ্‌রূপী জুড়ী। উজান বহিয়া আসিতেছে, অথবা স্রোতের সঙ্গে চলিতেছে মকর, কুম্ভীর, হাঙ্গরকুল, কুটাকাটী, পদ্মফুল—আরও কত কি!

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দেখিয়া শম্ভুর ভাব আসিল। বাল্যের সুখস্মৃতি—সেই হাসিতে হাসিতে কাঁদা, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসা, একধারে আলো অন্যধারে ছায়া—হরগৌরী ভাব লইয়া আকুল-

কুন্তলে, তরল কটাক্ষে শম্ভুর হৃদয়পানে একবার চাহিল! বই হাতে ছাতি মাথায়—সেই শিশুজীবনের চিরচঞ্চল চরণযুগলস্পৃষ্ট ধূলিকণাপূত কর্ণওয়ালিস কল্পনাপেষণে অতি ক্ষীণ হইয়া কারণ-দেহে নাগপাশবৎ তাহার অরক্ষিত হৃদয়টুকুকে জড়াইয়া ধরিল।

তখন কুললনার মত গৃহের কোণে আবদ্ধ, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিবলে সর্ব্বজ্ঞ—পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থল, তাহা আবার কমলালেবুর ন্যায় -সরস না হইলেও—উত্তরদক্ষিণপ্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা, রুষিয়ার উত্তরে কামস্কাট্‌কা, কামস্কাট্‌কার বনের বরফচাপা হাতী, বিসুবিয়স পর্ব্বতের অনলোদ্গীরণে ভস্মাচ্ছাদিত পম্পীনগর ইত্যাদি সর্ব্বদর্শী—"বিয়ে না হইতে সস্ত্রীক শকটা-রোহণে ক্রাকো"গামী, অথচ লোকচক্ষে হইতে পাঠশালা ও পাঠশালা হইতে গৃহ পরিক্রমণশীল,—ঘরের ভিতরে গৃহিনী-রূপিণী শারী-সম্মুখে দেহকণ্ডুয়ন তৎপর শুক পাখীটার মত ধীর, কিন্তু ঘরের বাহিরে শিশুগণমধ্যে নিত্য আস্ফালক, তর্জ্জনগর্জ্জনরত মহাবীর গুরু মহাশয়কে শম্ভুর মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুরু-মহাশয়-ধৃতা চিরচপলা যষ্টিগাছিও সমীরণে ধ্বনি তুলিয়া তাহার মানস-নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন বালক শম্ভুর লীলারঙ্গ—কখন ধূলি শয়ন, কখন সরোবরে সন্তরণ, কখন বা সমীরনমিত

তরুশাখাসংলগ্ন দোদুল্যমান রসালফলের রূপাকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষারোহণ, তৎপরে লগুড়হস্ত বৃক্ষাধিকারীর আবেশকর অভ্যর্থনার ভয়ে কুরঙ্গসুলভ চপলতার উল্লম্ফন—সেই 'গতস্যশোচনানাস্তি' যুগের মধুর জীবন মোহনবেশে হেসে হেসে যুবা শম্ভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শম্ভু চক্ষু মুদিয়া তাই দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমেই শম্ভু একটী দীর্ঘরেচকে হৃদয়ের গুপ্তদেশে যেখানে যা কিছু দুঃখদৈন্য ছিল, সমস্ত আকাশসাগরে ভাসাইয়া দিলেন! তারপরেই একটী প্রকাণ্ড পূরক! বায়ুকণার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরগৃহের সমস্ত সুখসাধ তাহার শূণ্যহৃদয় পূর্ণ করিয়া সেই হৃদয়ের একটী প্রকোষ্ঠেই নিশ্চল হইয়া রহিল, শম্ভুর শত চেষ্টাতেও তাহারা বাহির হইতে চাহিল না। নিরুপায়ে শম্ভু কুম্ভকযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বজীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিতে যাইয়া শম্ভুব দম আটকাইয়া গেল।

তখন কল্পনারম্ভেই শম্ভুর কুম্ভকযোগের দম্ভ দেখিয়া আমরা হতভম্ব হইয়া আকাশপানে চাহিয়া রহিলাম।

দেখিলাম শুভ্র রবিকিরণ-মিশ্রণে নীল-ধূসরাঙ্গ আকাশের গায় খণ্ড মেঘগুলি নানা মূর্ত্তি ধরিয়া—জলদকানন পরিধিমধ্যে কোথাও

সিংহ, কোথাও ব্যাঘ্র, কোথাও বা হস্তী, মৃগ, ভল্লুক—নানা বন্যজন্তুর মূর্ত্তি ধরিয়া, কালকেতুরূপী শম্ভুর কল্পনাশরনিকরে বিদ্ধাঙ্গ হইবার ভয়ে, যেন বিধাতার কাছে প্রতিবাদ করিবার জন্য সভা করিয়া বসিয়াছে।

সেই অস্পষ্ট "আবছায়া" মূর্ত্তিসমূহমধ্যে, চণ্ডীর বরপুত্র নগর বসাইবে আশায়—কোথাও বা মন্দিরের নমুনাস্বরূপ একটী অর্দ্ধভগ্ন চূড়া, কোথাও বা অট্টালিকার অর্দ্ধভগ্ন বাতায়ন-বক্ষ অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীর, কোথাও বা পূর্ণকুম্ভ, আবার কোথাও বা গোলাপ মল্লিকা যাতি যুথিকাদিশোভিত পুষ্পকানন, শম্ভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যেন স্বয়ংবরা কুমারীগণের ন্যায় রজতকিরণমালায় পরস্পরে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কোমলপ্রাণা অভিমানিনী ফুলরাণী শম্ভুর দৃষ্টি পড়িল না বলিয়া মনের দুঃখে গলিয়া গেল। প্রাচীর·মন্দির শম্ভুর অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া, জড়াজড়ি করিয়া, নৃত্যরঙ্গে মাতিয়া উদাসপ্রাণের পরিচয় দিল। সিংহব্যাঘ্রাদি শম্ভুর অবহেলায় ক্ষুব্ধ হইল, এবং অতি ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া—ভীমমূর্ত্তি ধরিয়া—যেন পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতেও রাগ থামিল না। তখন তাহারা কাননগর্ভে লুকাইয়া শম্ভুকে ভয় দেখাইবার জন্য অন্ধগগন ছাইয়া

ফেলিল। প্রকৃতিসুন্দরী—অতি কোমলপ্রাণা—শম্ভুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রমণীকুলগৌরবা বঙ্গীয়া দয়াময়ীর মত শম্ভুর দুঃখ-প্রতিকারের অন্য উপায় না জানিয়া বারকতক হুহু দীর্ঘশ্বাস আর বিন্দু বিন্দু চক্ষের জল ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সজল-দীঘল শ্বাসস্পর্শে শম্ভুর শুভ্রবাস দেহচ্যুত হইবার জন্য ব্যগ্র হইল। শম্ভুর কবিহৃদয় মাতিয়া উঠিল।

তখন কর্ণওয়ালিসের অনুপম রূপলাবণ্য দেখিতে দেখিতে রূপমোহজ বিহ্বলতায় তিনি কর্ণওয়ালিসকে মনে মনে প্রাণ সঁপিয়া—

"হে প্রিয়ে হে চারুশীলে কর্ণওয়ালিস!<br>
ধরিয়া তোমারে ভাষা খোলে পূরে<br>
সাহিত্যশয্যায় আজ করিব বালিস—"

বলিতে বলিতে ছাদ হইতে যেমন আধ্যাত্মিক ঝাঁপ খাইতে যাইতেছেন, অমনি উপরে নীচে, গহনে কন্দরে, গেলরে গেলরে শব্দ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে সুশীলাসুন্দরী মধুর নূপুর-নিক্কনে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া নীলচেলাঞ্চলে প্রাণাধিক শম্ভুর গলদেশ আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাকে ছাদের উপরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। শম্ভুর ভাবী বিরহাশঙ্কা হইতে নিস্তার পাইয়া মনের উল্লাসে

বিদ্যুল্লতা কড়কোলাহলে এক শ্যামল জলদতরঙ্গে ভাসিয়া পানকৌড়ির মত অন্য জলদে ডুব দিল। দেখিয়া বিষাদহর্ষে প্রকৃতিদেবী ভুবন ভাসাইতে আরম্ভ করিলেন।

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আমরা দেখিলাম, 'কনকলতা অবলম্বনে' শম্ভুর শ্বশুর-গৃহের ছাদে অবতীর্ণা সেই "হরিণীহীন হিনধামা" রামার ফুল্লেন্দীবর নয়নকমলের উপর কে যেন রক্ত-কম্বলের বিচি গুলিয়া মাথাইয়া দিয়াছে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### প্রাণারাম।

শম্ভুর ছাদ হইতে পড়িতে পড়িতে পড়া হইল না। আমাদেরও শম্ভুসঙ্গে কর্ণওয়ালিস পৃষ্টে চড়িতে চড়িতে চড়া হইল না। তা করিলে পাঠকেরও আর এ শুভ শম্ভুসংবাদ শুনিতে হইত না। কিন্তু কি করিব, তোমাদের ভাগ্য, আর আমাদের হাত-যশ আছে। সুতরাং অভগ্ন-হস্তপদ এই ভাগ্যবান সংবাদদাতার ইতি কথায় তোমাদের কর্ণকণ্ডুতি উৎপাদন কে রহিত করিবে?

ভাব গতিক দেখিয়া শম্ভুর শ্বশুর জামাতাকে নিজের আফিসে

একটা চাকুরী করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। শম্ভু বুঝিলেন, মূর্খ শ্বশুর এতকাল তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিল না। শম্ভু মনশ্চক্ষে তাহাকে অপরাধী দেখিলেন। আমরা কিন্তু দেখিলাম না। যদুপতি কতকাল ধরিয়া যাদব সমাজে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়জন তাঁর প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইয়াছিল? এই জন্যই উদ্ধব বিদুরের কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

দুর্ভগোবত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্ত ন বিদুর্হরিং মীনাঽইবোড়ুপং॥

লোক সকল ভাগ্যহীন, বিশেষতঃ যাদবগণ। দুর্ব্বাসার অভিশাপে সাগরমগ্ন সুধানিধি চন্দ্রকে যেমন মৎস্যগুলা চিনিতে পারে নাই, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহাদের চিরসহচর কৃষ্ণচন্দ্রকে হরি বলিয়া চিনিতে পারেন নাই।

মাছগুলা যদি চাঁদকে সুধাভাণ্ড বলিয়া জানিতে পারিত, তাহা হইলে অন্যমনস্কে একবার করিয়া তাহার গাত্র লেহন করিলেই অমর হইয়া যাইত। মানুষের জালে পড়িয়া মাটী ছুঁইতে না ছুঁইতেই পঞ্চত্ব পাইত না।

শম্ভু প্রথমেই শ্বশুর করালীচরণের উপর মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন "ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ

সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। ভাবিয়া দেখিলেন, ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গেই মোহ আসিবে, আর মোহ আসিলেই স্মৃতিনাশ। সর্ব্বনাশ! পথে বাহির হইবামাত্র এত সাধের আশ্রমকুঞ্জ অনিদান মানময়ী চারুশীলা সুশীলার বিশ্রাম নিকেতন শ্বশুর ভবন তাঁহার মানসপট হইতে মুছিয়া যাইবে! একবার সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়া ফিরিতে, শ্বশুর গৃহস্থানে অন্য কাহারও দ্বারে করাঘাত করিলে কিনা ঘটিতে পারে! প্রহার খাইবার ভয়ে শম্ভু মনের রাগ মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

রাগ চাপিতে যাইয়া শম্ভুর মনে অনুরাগ আসিল। তাঁহার আঁখিযুগ সিক্ত হইল। শম্ভু মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"বিনা উপার্জ্জনে বাস্তবিকই কি আমার জীবনটা অসার রহিয়া যাইবে?"

মনের ভিতর হইতে কে যেন উত্তর করিল—"কেন যাইবে?"

"এই যে যাইতে বসিয়াছে!"

"কই আমিত দেখিতেছি না। বরং আমি দেখিতেছি, "অসারে খলু সংসারে' তুমিই সার জিনিষ আশ্রয় করিয়া আছ।"

"তবে কি আমাতে শক্তি আছে?"

"তোমাতে যে শক্তি আছে, তাহা কয়জনের আছে?"

"বল কি!"

"তুমি যোদ্ধা হইতে চাহিলে যুধিষ্ঠির, বাগ্মী হইতে চাহিলে বাবর, কবি হইলে কালকেতু, গায়ক হইলে গরিলা আর দস্যু হইতে ইচ্ছা করিলে দাতাকর্ণ হইতে পার।"

"আর যদি কিছু না হইতে চাই?"

"তাহা হইলে বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরহীকুলের বোপদেব হইতে পার।"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শম্ভু শেষোক্ত হওয়াটাই সুখসাধ্য মনে করিলেন। এবং মনের আবেগে বাঙ্গালীর বিদ্যার মান-মন্দিরকে জোড়া মহিষ মানত করিলেন।

জোড়া মহিষের লোভে মানমন্দির শম্ভুকে এক মানসিক টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া দিলেন। খাম খুলিতে না খুলিতে তিনি দেখিলেন—দুইটী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাহার মনের মত হাসি মুখে মাখিয়া খামের ভিতর বসিয়া আছে। তাহারা শম্ভুকে পাইবামাত্র তাঁহার মস্তিষ্ক দখল করিয়া বসিল। তাহাদের একটী হইল নায়ক, অপরটী হইল নায়িকা।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### প্রতারণা।

মানবের দৃষ্টির বহুদূরে, শম্ভুর মস্তিষ্কদেশের এক নিভৃত প্রান্তরে নায়ক নায়িকা বসিয়াছিল। অগণ্যতারকাসনাথ নীল আকাশের তলে, চিন্তাতরঙ্গিণী কুলকুল করিয়া সেই প্রান্তর প্রদেশ দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। নায়িকা পা ছড়াইয়া বসিয়া এক দৃষ্টে বন্ধুরা তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-ভঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছিল। নায়ক পদ্মপলাশ-লোচনা পার্শ্বগতা সহচরীর মাধুরীভরা মুখখানির দিকে চাহিয়া-ছিল। যতক্ষণ না পলক পড়িতেছিল ততক্ষণ নায়ককে চিত্রার্পিতের ন্যায় দেখাইতেছিল। পলকেই শুধু জীবনের অস্তিত্ব লক্ষিত হইতেছিল। নায়িকা কিন্তু ক্ষোদিতা মর্ম্মরমূর্ত্তির ন্যায় স্থির, চক্ষু পলকহীন।

নায়িকার মুখ দেখিতে দেখিতে নায়কের মুখ ফুটিল। নায়ক বলিল—"অয়ি নায়িকে!"

নায়িকার প্রাণের নীরবতায় ঢুপ ঢুপ করিয়া ঘা পড়িল। নায়িকা মুখ ফিরাইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল। নায়িকা

মৃদু হাসিয়া লজ্জানতমুখী—কথা কহিল না। নায়ক আবার বলিল—"সখী নায়িকে!" উত্তর পাইল না। তখন চিবুক ধরিয়া নায়িকার মুখ তুলিয়া, চোখের উপর চোখ রাখিয়া নায়ক আবার বলিল—"নায়িকে—সই!"

সমীরোত্তোলিতা অতসীর ন্যায় আবেশকর বলপ্রয়োগে একবার মাত্র মুখ তুলিয়া আবার তখনি সোহাগভরে নামাইয়া নায়িকা বলিল—"কি?"

নায়ক। হাঁ সই! শম্ভুকে লইয়া কি করা যায়?

নায়িকা। কি জানি সখা!

নায়ক। তুমি না জানিবে ত কে জানিবে সই!

নায়িকা। তুমি।

নায়ক। আমিই যদি সই, তবে বলি শুন। এই যে বিশ্ব-বিদ্যা ঠাকুরাণী শম্ভুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাদের এখানে পাঠাইয়া দিলেন তা আমরা আসিয়া শম্ভুর নীরস মস্তিষ্কে বসিয়া বসিয়া করিব কি? এখানে আছে কি? না আছে গোলাপ মল্লিকাদি-শোভিত কুঞ্জকানন—ফুলপরিমলাঙ্গরাগ কুঞ্জবন—বসি কোথায়? না আছে লীলাকমলালয়া তরলতরঙ্গ-ভূষণা সরসী—না আছে তটভঙ্গ-রঙ্গময়ী ফেনিলসলিলা কল্লোলিনী—

ভাসি কোথায় ? না আছে প্রাবৃট্-জলদস্পর্শী জলদবরণাঙ্গ শুভ্রচূড় শৈল—না আছে প্রাসাদ-পুষ্প-কাননতুল্য। কলিকাতার শাল-তরুরূপী মনুমেণ্ট উঠি কোথায় ?

নায়িকার মুখকমল উষার শশাঙ্কের ন্যায় কি একটা অনাগত দুঃখের আগমনাশঙ্কায় অলক্ষ্য পরিবর্ত্তনে মলিন হইয়া গেল। নায়ক তাহা দেখিল না। আবার বলিল—"ভাই! নায়িকা! অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কল্পনার কথায় এখানে আসিয়া ভাল করি নাই। এমন স্থান কই, যে তোমায় আমায় হাত ধরাধরি করিয়া, উর্দ্ধে অনন্ত আকাশের দৃষ্টি-সীমাবদ্ধ সুনীল ব্যোমগঙ্গা-জলে তারকামণ্ডলমধ্যে চিত্রাচন্দ্রমার ধীর সন্তরণ নিরীক্ষণ করিব! এমন গাণ কই, পঞ্চমসংবাদী সমীরণনিস্বনে স্বর মিলাইয়া গাহিয়া গাহিয়া নিশীথনীরবতা ভঙ্গ করিব!"

নায়িকার চক্ষে জল আসিল। দুই এক বিন্দু অপাঙ্গ ছাড়িয়া গণ্ডে পড়িল। সেই জঙ্গম মুক্তাফলকে আলোক প্রতিবিম্বিত হইয়া, নায়কের চক্ষু দিয়া রন্ধ্রে প্রবেশ করিল - "ওকি নায়িকা তুমি এখনি কাঁদ্‌ছ!"

নায়িকা। কি করি সখা! তোমার কথা শুনিয়া চক্ষুজল রাখিতে পারিতেছি না। তবে কি শম্ভুর জীবন নিষ্ফলে যাইবে!

এত সাধনা করিয়া শম্ভু আমাদের আনিয়া মস্তিষ্কে স্থান দিল, এমন সাধক শম্ভুকে ছাড়িয়া যাইব কোথায়? কে আমাদের এত আদর করিবে? কে আমাদের যত্ন করিয়া বসাইয়া আশাবারি নিষেকে আমাদের দেহের জড়তা দূর করিবে? কে আমাদের বিধবার ধনের মত, কাকবন্ধ্যার নন্দনের মত, বিদুষীর রুচির মত, কুলবতীর লজ্জার মত বুকের জিনিষ বুকে রাখিবে? গ্রাডুয়েটের ডিগ্রীর মত, পাচক ব্রাহ্মণের জুতার মত শিকায় তুলিয়া রাখিবে—ভূমিতে নামাইবে না! কবির দারিদ্র্যের মত, ডেপুটীর গর্ব্বের মত, নদীর জলের মত, কলিকাতার অন্তর্নিহিত নলের মত, বঙ্গের জ্বরজ্বালার মত আমাদিগকে জীবনের সাথী করিয়া রাখিবে—প্রাণান্তেও ছাড়িবে না! চোখে চোখে রাখিতে, প্রাণে প্রাণে মাখিতে শম্ভুর মত আর কে আছে? এই সাগরমেখলা ধরণী মধ্যে আর কে আছে, শম্ভুর মত আমাদিগকে সোণার চক্ষে দেখিবে, আজন্মযত্নরক্ষিত কথা সুধাধারে আমাদিগের তর্পণ করিবে? দেখাইয়া দাও, আর কোথায় এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা! বলিয়া দাও, এমন প্রেমিক আর কোথায় আছে, যাহার কাছে এমন আদর, এমন যত্ন, এমন সুখ পাইব! বল—এখনি শম্ভুকে ছাড়িয়া তোমার হাত ধরিয়া তাহার ঘরে

যাই। কিন্তু নায়ক! আমার বিশ্বাস জগতে এমন ঠাঁই আর নাই।

নায়িকার বুক ভাসাইয়া চক্ষুজল গড়াইয়া গেল। নায়ক পকেট হইতে পারিজাতগন্ধ রুমাল বাহির করিয়া, নায়িকার মুখ চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল—"ওকি! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি কি শম্ভুকে ছাড়িয়া যাইবার কথা বলিতেছি?"

নায়ক মিথ্যা কথা কহিল। প্রেমিকার মনস্তুষ্টির জন্য মিথ্যা কওয়ায় দোষ হয় না। কেননা সরলা নায়িকা, এই কথাতেই আশ্বস্তা হইল—চোখের জল শুকাইল—মুখে হাসির ক্ষীণরেখা দেখা দিল। সেই কোমল হাসি-আকৃষ্ট হইয়া নায়কের মন ফিরিয়া গেল।

নায়ক মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"শম্ভুকে ছাড়িয়া যাইবার কথা বলি নাই। যখন আসিয়াছি, তখন ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক, শম্ভুর ঘরেই বাস করিব। আর যাইবই বা কোথায়? আমাদের মনোমত স্থান এদেশে আর কোথায় আছে? এখানে শম্ভু সেখানে নিশম্ভু—এখানে "সিলা", সেখানে "কারিব্‌ডিস্‌"। এপাশে বিশ্ববিদ্যালয় ওপাশে হাঁসপাতাল। শম্ভুর তবু খোড়ো ঘর, অন্য স্থানে মাঠ—শম্ভুর কাছে ভাঁড়ে জল, অন্যের কাছে ঘাট। না নায়িকে! কোথাও যাইব না। শম্ভুর

ঘর ছাড়িয়া এক পাও বাড়াইব না—শম্ভু যদি নিজেও আমাদিগকে ছাড়িতে চায়, আমরা শম্ভুকে ছাড়িব না।”

চিন্তা-স্রোতস্বতী-বক্ষে কতকগুলি সুন্দর তরণী ভাসিতেছিল—তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছিল—কিন্তু একটীতেও কাণ্ডারী ছিল না। তাহাদের সকলেরই গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা ছিল। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, চম্পূ—বড়, মাঝারী, ছোট; উপন্যাস, রহোন্যাস, নবন্যাস—সুসজ্জিত, আধবাহারে, নেড়া;—নানাপ্রকারের তরণী! কবিতা, স্বনিতা, ভণিতা—ফলধরা, ফুলেঘেরা, জলেভরা; নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন—লাল, নীল, পীত—নানাবর্ণের তরণী! লম্বা, চৌড়া, চেপ্টা, গোল—নানা গঠনের তরণী! কাহারও শুধু দাঁড়, কাহারও বা হাল, কাহারও কেবলমাত্র পাল। কেহ হেলিতেছে, কেহ দুলিতেছে, কেহ ঘুরিতেছে। আবার কেহ বা সমীরণপ্রহৃত পালের ভরে টাল খাইতেছে। টেরা, বাঁকা, ফাঁকা, ঝগঝগে, রগরগে নানা জাতীয় নৌকা তটিনীবক্ষে ভাসিতেছিল। দেখিতে সকলই চমৎকার—কিন্তু একটীতেও নাবিক ছিল না। নায়ক আর কোনও কথা না বলিয়া নায়িকার হাত ধরিয়া তাহাদিগের একটীতে উঠিয়া বসিল।

তখন “সিন্ধুকূলে রই, নূতন তরী বই, পারে তোরা কে

যাইবি গো!"—অকূলসাগরে ভাসমান বাঙ্গালী পাঠক, এই গাণ শুনিয়া কূল পাইবার জন্য সেই তরণী উদ্দেশে ছুটিল। কিন্তু যেই কাছে গিয়া শুনিল—"দান দিবে যেই পার হবে সেই"—অমনি

যে পথে যাইয়া শ্যামরায়
আনিতে গিছিল রাধিকায়,
সে পথে আয়ানে দেখে
মনের দুঃখ মনে রেখে,
ফিরে, ঝাঁপ দিল যমুনায়।

আসল কথা, শম্ভুর রচনায় কেবল অনুগ্রাহকই জুটিতে লাগিল, গ্রাহক জুটিল না। বিশ্ববিদ্যামন্দিরের পূজক "ভ্রাতা পঞ্চজনা" মন্ত্রণা করিয়া শম্ভুর অতি পরিশ্রমের ফল, গোলদিঘীর গরমজলে ভাসাইয়া দিল। বাঙ্গালীর কোন এক দুর্দ্দিনে ছাপাখানার ভূতেরা বিদ্রোহী হইয়া, তাহাদের চিরন্তন প্রভু ভূতনাথ শম্ভুর শ্বশুর দক্ষমহাশয়ের গৃহ অবরোধ করিয়া বসিল। তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে দক্ষকন্যা সুশীলার অঙ্গাভরণ 'বিক্রমপুরে' চলিয়া গেল। শম্ভুকে বিশ্ববিদ্যা পর্য্যন্ত প্রতারিত করিল!

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### প্রহার।

এখন একটা বড় বিপদ ঘটিল। শম্ভু আর সময়ে নায় না, সময়ে খায় না, ভাল করিয়া কথা কয় না, লোকের সঙ্গে মিশে না। শম্ভু কি কার্য্য করিতে কি কার্য্য করে, কি কথা বলিতে কি কথা বলে—কি বুঝিয়া আপন মনে কখন বা কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া থাকে, কখন বা পাদচারণে কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যায়!

শম্ভু শ্বশুরের মনে উদ্বেগ তুলিয়া, সুশীলার প্রাণ কাঁদাইয়া, আদরের ধন নলিন নলিনীর তরল চোখচতুষ্টয়ে ফেলফেলত্ব আনাইয়া, শ্বশুরের গৃহে বসিয়া বসিয়া কৃষ্ণপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন।

কারণ কি? শম্ভুর শ্বশুর সুশীলা সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা সুশীলে! শম্ভু বাবুর এ অদ্ভুত ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ কি?" সুশীলা কোনও উত্তর করিলেন না। কেবল ধারাবর্ষণোন্মুখ নয়নযুগলে বাপের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া

মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! স্বামীর এ অদ্ভুত ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ কি?" শম্ভুর শাশুড়ী শম্ভুর শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁগা! জামাইয়ের আমার এমন অদ্ভুত ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কি?" উত্তর পাইলেন না—তখন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—উত্তর পাইলেন না। নিরুপায় হইয়া নলিনীর হাত ধরিয়া ভাবনার অকূল পাথার অভিমুখে চলিয়া গেলেন। তখন ভৃত্য দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, দাসী সুশীলার পিসীকে বলিল, পিসী পাড়াপড়সীকে সুধাইল—"কারণ কি?—শম্ভুবাবুর এ অদ্ভুত ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ কি?" পাড়াপড়শী দিবানিশি সেই কথার জল্পনা করিতে লাগিল—কারণ কি? কারণ কি? ওদের বাড়ীর জামাইয়ের এই অদ্ভুত ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ কি?

আসল কথা—শম্ভুর মনের অবস্থা এখন কেমন এক রকম হইয়াছিল—কেমন এক রকম সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল। আমরা অতি ঐশ্বরিক অন্তর্দৃষ্টিবলে শম্ভুর হৃদয় মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত পাড়াপড়শী মাসী পিসী কাট্‌কপাসীর সঙ্গে "কারণ কি, কারণ কি" বলিয়া জিজ্ঞাসায়

প্রতিজিজ্ঞাসায়—লম্বা চৌড়া ধ্বনিরসালঙ্কারশোভনা ভাষায় টানিয়া টানিয়া অনন্তাশ্বমানী করিয়া তুলিতাম। তখন কে কত লিখিত, কে কত পড়িত—আর কে কত সমালোচনা করিত!

যথার্থই শম্ভুর ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। আগে শম্ভু উপযাচক হইয়া লোক ডাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেন—বাড়ীর কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া চাকর দাসীটী পর্য্যন্ত তাঁর কথায় মিষ্টতা পাইত। এখন শম্ভুর কাছে যাইয়া, "শম্ভু বাবু শম্ভু বাবু" বলিয়া, শতবার চেঁচাইয়া, হাঁকাহাঁকি করিয়া, ডাকাডাকি করিলেও শম্ভু বাবুর কথা নাই। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, চোখ রাঙাইয়া রুষিয়া রুষিয়া মুখ ফিরাইয়া শম্ভু ভাব-সাগরে ডুবিয়া যাইতেন। স্বামীগতপ্রাণা-সুশীলাগতপ্রাণ শম্ভু দুই দিনে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেলেন।

তখন শম্ভুর শ্বশুরশ্বাশুড়ী—কর্ত্তাগিন্নীতে কলহ আরম্ভ হইল। গিন্নী কর্ত্তাকে বলিলেন, "তুমিই আমার অমন সোণার চাঁদ জামাইকে পাগল করিলে—তুমি যদি দুইবেলা মেয়েটার অদৃষ্টের নিন্দা না করিতে—যদি বাছাকে আমার শুনাইয়া শুনাইয়া মেয়েটাকে যা মুখে আসে তাই না বলিতে, তা হ'লে বোধ হয় বাছার আমার এমন অবস্থা হইত না! তোমার আর কিছুতেই আশা

মিটিল না। খাবার পরবার সংস্থান আছে—তবু বাছার উপার্জ্জন না খাইলে তোমার আর পেট পূরিল না। তাই শান্ত শিষ্ট বাছাকে নিশ্চিন্ত হইয়া দুমুটা ভাত খাইতে দিলে না। মেয়ের নিন্দা বাছার আমার সহ্য হয় না। কাজেই সুশীলার কষ্ট দেখিয়া শম্ভু আমার ভাবিয়া ভাবিয়া কি রকম হইয়া গিয়াছে।”

প্রতিদিনই ঝগড়ার প্রারম্ভে দুই একবার ফোঁস ফোঁস সমীরণ-প্রবাহ ও গভীর গর্জ্জন এবং ঝগড়া-শেষে দুই চারি ফোঁটা বারি পাত হইত। কাজেই কর্ত্তা দিন দিন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কর্ত্তা দেখিলেন, জামাতৃ-প্রবোধন-হলচালনে তাহার অদৃষ্টক্ষেত্রের নবাঙ্কুরিত আশালতা বুঝি মাথা তুলিতেই হাজিয়া যায়। তখন আর অন্য উপায় না দেখিয়া সুশীলাকে “কটুভাষিণি! স্বামীর মর্ম্ম বুঝিলি না—কি বলিতে তারে কি বলিলি” বলিয়া দুটা তিরস্কার করিলেন। পিতৃতিরস্কৃতা সুশীলা অদৃষ্ট ভাঙিয়াছে বুঝিয়া তিরস্কারে তিরস্কারে হতভম্ব তনয়তনয়াকে গোটা দুই চাপড় মারিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বালক-বালিকা কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল—বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

শম্ভু এখন কোথায়? তিনি কি জানি কি ভাবিতে ভাবিতে,

চলিতে চলিতে, প্রান্তরসাগরগত কর্ণওয়ালিসের ধূলিশীকরসেবিত হইয়া ধর্ম্মতলায় যাইয়া হাজির হইয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। রাজশ্রীচরণপ্রসেকপবিত্রতৈলপ্রসবি ঘানীর ন্যায় পৃথিবীটা তখন বাস্তবিকই ঘুরিতেছিল। মোটরের বোঁ বোঁ, ট্র্যামের ট্যাং ট্যাং "মি লর্ড" ফিটনের কররং—অতিবড় বুদ্ধিমান পথিককেও হতভম্ব করিয়া তুলিতেছিল। ইডেনোদ্যান কিম্বা প্রান্তরগস্তকাম সাহেব দম্পতির গাড়ীর পশ্চাৎ দিকের সহিস প্রভুর "এই-ই-ও মাগী"—ইত্যাদি নিদ্রাকর্ষিণী কথামালা রংএর উপর রসান দিতেছিল। প্রকৃতির যত শোভা চাপা পড়িবার ভয়ে তখন মোটর, ডগ্‌কার্ট, ব্রুহাম, ট্যাণ্ডমের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল।

শম্ভুর ক্রিয়াকলাপদর্শী কোন বন্ধু ঘটনাক্রমে সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, শম্ভু বাবুর মত কে যেন একজন গাড়ী ও গাড়ীর ভিতর কি দেখিতে দেখিতে কিম্বা কি যেন দেখিবার জন্য হাঁ করিয়া পথ চলিতেছে। এমন সময় একখানা জুড়ী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড় পড় হইল। "হাঁ হাঁ—গেল গেল —এইও এইও—ড্যাম নিগার"—পথ হইতে, ছাদ হইতে, আকাশ হইতে, গাড়ীর ভিতর হইতে নানা জাতীয় শব্দ উঠিল। ঘোঁড়ার মুখ ফিরিল, কিন্তু 'অশ্বপৃষ্ঠলক্ষ্যে উত্তোলিত একটা চাবুক শম্ভুর পৃষ্ঠে

পতিত হইল। শম্ভুর চমক ভাঙ্গিল। তখন বন্ধু গাড়ী হইতে নামিয়া, শম্ভুর হাত ধরিয়া, তৎপথচারী পথিকগণের টিট্‌কারীর মধ্য দিয়া তাহাকে লইয়া গাড়ীতে তুলিলেন। গাড়ী গড় গড়—ঘড় ঘড়—ছ্যাকড় ছ্যাকড় করিতে করিতে শম্ভু ও তাহার বন্ধুকে নাচাইতে নাচাইতে শম্ভুর শ্বশুর বাড়ী যাইয়া পৌঁছিল। শম্ভু গাড়ী হইতে নামিয়া শ্বশুর বাড়ীর সদর দরজার রোয়াকে থপাস্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বন্ধু তাঁহাকে শ্বশুরের হাতে সমর্পণ করিয়া সেই গাড়ীতেই চলিয়া গেলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### প্রায়শ্চিত্ত।

স্বামীর আগমন-সংবাদে আকুলান্তরা কিন্তু অনুতাপবিদগ্ধা সুতরাং রোরুদ্যমানা সুশীলা বাহিরে আসিয়া স্বামীর চরণপ্রান্তে লুটাইলেন। শ্বশুর ঘরে বসিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। শ্বাশুড়ী জামাতার অবস্থা দেখিয়া নিজের কন্যার দুরদৃষ্ট বুঝিয়া পরলোকগতা জননীর উদ্দেশে রন্ধনশালায় বসিয়া কাঁদিলেন। পিস্‌শ্বাশুড়ী কি করিয়াছিলেন শুনি নাই। নলিন

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নলিনী এখনও ঘুমায় নাই। সে মায়ের পাছু পাছু বাপের কাছে আসিয়া জননীকে ভূপতিতা দেখিয়া, কি ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া সুশীলার অঞ্চল ধরিয়া টান দিল। তনয়াকৃষ্টা সুশীলা দাঁড়াইয়া স্বামীকে বলিলেন—"নাথ! আমি তোমার স্ত্রী, দাসী, শিষ্যা, স্বামীর মঙ্গলাভিলাষিণী—কথা কহিতে না জানায় কি বলিতে কি বলিয়াছি। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হইবে বিবেচনায় তোমায় তুষ্ট করিতে গিয়া অপরাধ করিয়াছি। জ্ঞানকৃত অপরাধেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে। আর আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? স্বামিন্! প্রভু! গুরু! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" সুশীলার লোচন-জল শম্ভুর চরণস্পর্শ করিল।

এতক্ষণ শম্ভু নীরব ছিলেন। শম্ভুর চিন্তা হৃদ্গত কথা-কুসুমরাশিকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পরাস্ত হইয়া, বালিকার কোমল কণ্ঠকম্পনদর্শনে লজ্জিত হইয়া, তাহাদিগকে ভুজপাশ হইতে ছাড়াইয়া দিল। ছাড় পাইয়া তাহারা নবোঢ়া বালবধূগণের সভয়চরণবিক্ষেপের ন্যায় সুশীলার কর্ণকুহররূপ শ্বশুর-ভবনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সুশীলার বিষাদমাখা মুখ দেখিয়া, শোকাবেগ-সঞ্জাত-সলিল-

ধারাপ্লুত হৃদয়তরঙ্গের উন্নতি অবনতি দেখিয়া—চঞ্চলচাহনির আধার নয়ন-দুখানির ছলছলানি নিরীক্ষণ করিয়া, শম্ভুর পরাণি আকুল হইয়া উঠিল।

দুইচারি কথা বলিতে না বলিতেই শম্ভুর আবার ভাবতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। সেই ভাবতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে শম্ভু শ্রাবণজলদরূপিণী অমৃতময়ী ভাষায় সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"প্রিয়ে! তুমি সে আমার গতি।
তোমারই কারণে কাব্য তত্ত্ব লাগি
শ্বশুর ভবনে স্থিতি।
শুনলো প্রেমের কুম্ভ,
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইল শম্ভু।
সুশীলার রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়,
না দেখিলে মন হয় উচাটন
হেরিলে প্রাণ জুড়ায়।

তোমারই যাজন ত্রিসন্ধ্যা পূজন
তুমি সে গলার হারা।
তুমি রাধারাণী অনঙ্গ-মোহিনী
তুমি সে জননী তারা।

সম্বোধনের ঘটা ও কাব্য কথার ছটা শুনিয়া সুশীলার বক্ষ ফাটা ফাটা হইল। কিন্তু তাঁর সে অবস্থা দেখে কে? তাঁর বক্ষা-লোড়নোদ্ভূত, নাসিকা প্রদেশ দিয়া সশব্দ বহির্গত দীর্ঘ শ্বাস শুনে কে? শম্ভু এখন সুশীলাময়। শম্ভু পদ্য ছাড়িয়া গদ্য ধরিলেন। "কি বলিলে সুশীলে! তোমার অপরাধ! তুমি যদি আমার কাছে অপরাধী, তাহা হইলে আমার মত পাপী কে আছে? কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে আমার মত পাপী? সুশীলে, সুশীলে! কে বলে তুমি আমার স্ত্রী? তুমি কি কেবল আমার স্ত্রী? তুমি আমার সব।—সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা—"

"ওমা! কি হ'ল গো! জামাইয়ের কেন এমন হ'ল গো! শম্ভু আমার এমন কেন হ'ল গো—দাদা গো"—কপাটের অন্তরাল

হইতে সকরুণ চীৎকার উঠিল। গাভী মুখকবলিতপত্রা কদলীর মত সুশীলা ভূপতিতা হইলেন। নলিনী মায়ের সঙ্গে মাটীতে লুণ্ঠিত হইল।

কপাটের অন্তরাল হইতে শম্ভুর পিস্‌শাশুড়ী বাহির হইয়া, শম্ভুর সম্মুখে ভূমিপতিতা, বিগতচেতনা সুশীলাকে তুলিতে তুলিতে বলিতে লাগিলেন, "কি করলি বাবা শম্ভু! কি বল্লি বাবা! তোর মুখে এমন কথা শুনিতে হইবে, এত কখন স্বপ্নেও ভাবিনি! বাবা শ-অ-অম্ভু"!—পিসির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

তখন একজন ভৃত্য এক ঘড়া জল লইয়া ছুটিয়া আসিয়া শম্ভুর মুখে চোখে মাথায় সেচন করিতে লাগিল। ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া, শম্ভুর কি বলিতে বলিতে বলা হইল না। রজনী সুন্দরী শম্ভুর রঙ্গ দেখাইবার আর লোক পাইলেন বলিয়া উদয়-সাগরের জল হইতে চাঁদকে টানিয়া আকাশে তুলিলেন। ঘড়ীতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

পরদিন প্রভাতে বিজ্ঞ পুরোহিত আসিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। শম্ভু বঙ্কিম বাবুর "বিষবৃক্ষের" দোহাই দিয়া পুরো-হিতের দুর্ব্ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন— "মনের সাধে বিষবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আমি প্রাণময়ী সুশীলাকে অঞ্জলি দিয়াছি।" প্রতিবাদে ফল হইল না।

পরন্তু পুরোহিত বিষবৃক্ষের পুষ্পগন্ধে অপঘাত মৃত্যুর ভয়ে উত্তরীয়ে নাসিকাচ্ছাদিত করিলেন। তাই দেখিয়া শম্ভুর ক্রোধ পরিবর্দ্ধিত হইয়া গেল। যৎকিঞ্চিৎ আরক্তলোচনে ঈষদুচ্চকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"রে ত্রিসন্ধ্যা ত্র্যহস্পর্শ, ববকরণ ব্যতীপাত ব্যবসায়ী বিনয়াবতার বিভীষণ—" শম্ভু অধিক বলিবার অবকাশ পাইলেন না। পাড়ার বিজ্ঞগণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার মুখ রুদ্ধ করিল।

পুরোহিতের পক্ষাবলম্বন করিয়া পাড়ার বিজ্ঞগণ শম্ভুর মস্তক মুণ্ডিত করাইল; এবং বন্দেমাতরং বলিয়া তাহাতে ঘোল ঢালিতে আরম্ভ করিল। তদবস্থ হইবার ভয়ে আমরাও সেস্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

# গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

## নাটক।

### ( ঐতিহাসিক )

(১) প্রতাপাদিত্য—বেঙ্গলী দুই স্তম্ভব্যাপী সমালোচনায় বলিয়াছেন, "ইহা যথার্থতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় নাটক। 'বিজয়া' বাঙ্গালার মর্ম্মনিহিতা শক্তি; প্রতাপ তাহার সাধক, সূর্য্যকান্ত গুহ উত্তর সাধক; শঙ্কর চক্রবর্ত্তী পুরোহিত।" মূল্য, একটাকা।

(২) পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত—নবাব মীরকাসিমের প্রাণকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্যই যেন শক্তিময়ী 'বিজয়া' এবারে নর্ত্তকীরূপে বীর মোহনলালের কন্যা হইয়া জন্মিয়াছেন। পিতা ও পুত্রী মুরশিদাবাদের উদ্যানে বসিয়া পলাশীর রণক্ষেত্র সম্বন্ধে যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, নাটকের সেই অংশটুকু পাঠ করিলেই যুগের চিন্তা আসিয়া পাঠককে এক স্বপ্নরাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। মূল্য, এক টাকা।

(৩) নন্দকুমার—ইহা মহারাজা নন্দকুমারের জীবন্ত চিত্র। আজ দেড়শত বৎসর পরে, সপ্ততি-বর্ষীয় স্থবির নিজের সমস্ত দুঃখ কাহিনী লইয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। মূল্য, এক টাকা।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল নিউইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন—'প্রতাপাদিত্য' অপূর্ব্বগ্রন্থ হইলেও, 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকত্বে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ; কিন্তু 'নন্দকুমার' তাঁহার নাটকীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা।

(৪) পদ্মিনী—বাংলা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, মাতৃভূমির অপরাংশে শ্রেষ্ঠবীরগণের লীলাভূমি চিতোরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, মহীয়সী রমণী পদ্মিনী ; আর সেই মাতৃভূমির পূজক গোরা ও দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বাদল !

"শ্রাবণের বারিধারা প্রায়, পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।" শুধু শুনিয়াছেন; দেখেন নাই। ভীষ্মের শরশয্যার ন্যায় বীরগোরার রণাঙ্গনে নরশয্যা—দেখিলে প্রাণে নবশক্তির সঞ্চার হইবে।

স্বনাম-ধন্য মহানুভব সর্ব্বপরিচিত ব্যারিষ্টার সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস পদ্মিনীর অভিনয়ে সম্রাট আলাউদ্দীনের চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"এরূপ অদ্ভুত চরিত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত নাট্য সাহিত্যে নূতন।" মূল্য, এক টাকা।

(৫) চাঁদবিবি—দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের রাণী, আমেদনগরের রাজনন্দিনী—রমণীকুলের ভূষণ স্বরূপা চাঁদসুলতানার চরিত্র পাঠে শুধু আনন্দ নয়, পুণ্য আছে। এই পবিত্রা মুসলমান মহিলা কি অপূর্ব্ব প্রীতিসূত্রে হিন্দু মুসলমানকে আবদ্ধ করিয়া আপনার দুইটী সন্তান মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন, পাঠক ! পুস্তক পাঠে বুঝিতে পারিবেন। মূল্য, এক টাকা।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচার পতি শ্রীযুক্ত শারদাচরণ মিত্র

মহোদয় লিখিয়াছেন—"বালেশ্বরের সমীপে সমুদ্রতীরে এক নির্জ্জন কুঞ্জে বসিয়া তোমার চাঁদবিবি পাঠ করিলাম। সমুদ্রোর্ম্মী ও তোমার ভাষার তরঙ্গ, মধ্যে বসিয়া আনন্দানুভবের এই উপযুক্ত স্থান।"

বন্দেমাতরং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় অভিনয় দেখিয়া এই কয়খানি নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই অপূর্ব্ব পুস্তকগুলি স্বদেশের উন্নতি কল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।" বাংলার শত শত স্থানে অভিনীত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক (millions) ইহা দ্বারা বাঙ্গালীর মহিমা অবগত হইয়াছে। এই কয়খানি নাটক ক্রমান্বয়ে না পড়িলে, প্রতাপাদিত্য পাঠ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বে যাঁর অভিমান আছে, তিনি এই পুস্তকগুলি গৃহে না রাখিয়া থাকিতে পারিবেন না।

## ( কিংবদন্তী )

(৬) রঙ্গাবতী—ধর্ম্মমঙ্গল অবলম্বনে বিষ্ণুপুর ও অম্বিকানগরের পুরাকাহিনী লইয়া লিখিত। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের স্বাধীন বাঙ্গালার অভ্যন্তরীণ অবস্থা, এবং তৎকালীন ডোম বাগ্‌দী প্রভৃতি নীচ জাতীয় বাঙ্গালীর স্বদেশ নিষ্ঠা, প্রভুভক্তি ও অমানুষিক বীরত্বের যদি আভাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই পুস্তক পাঠ করুন। তাহ'লেই বুঝিবেন, নিদারুণ ধর্ম্ম-বিপ্লবে, শত দুর্ভিক্ষে, সহস্র ঝঞ্ঝাবাতে আজিও পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সমস্ত হারাইয়াও কেমন করিয়া বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখিয়াছে। মূল্য, এক টাকা।

## ( পৌরাণিক )

(৭) [illegible]ত্রী—[illegible]ীরোদ বাবুর 'সাবিত্রীর' নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। [illegible] এরূপ মধুর চরিত্র অতি অল্পই আছে। হাই-কোর্টের ভূ[illegible]চারপতি শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"আপনার পবিত্র লেখনীর উপযুক্ত—অপূর্ব্ব—গম্ভীর।"

(৮) উলুপী বা বভ্রুবাহন—এক উলুপী চরিত্র দেখিলেই বুঝিবেন, ভারতীয় যুগে বাঙ্গালী জননী কিরূপ ছিলেন, আর এখন তিনি দেশের দুর্ভাগ্যে কিরূপ হইয়াছেন। স্বদেশ প্রেমিকা বীরাঙ্গনার কাছে, তাঁহার সপত্নী পুত্র আপনার হইয়াছে, আর আপনার মাতৃ-ভক্ত পুত্রও পর হইয়াছে। পৌরাণিক কথা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না। পাঠ করিবেন। বঙ্গবাসী বলিয়াছেন—"ইহার চরিত্র সেক্‌স্‌পিয়রের চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়।"

## ( ঔপন্যাসিক )

(৯) জুলিয়া—মধুর সংযোগান্ত নাটক—পড়িলে ভাব স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হয়। ইহার রস মাধুর্য্য ক্ষীরোদ বাবুর সমস্ত নাটককে পরাস্ত করিয়াছে। মূল্য, বারো আনা।

(১০) দৌলতে দুনিয়া—অলৌকিক ব্যাপার লইয়া লিখিত। ভাষাও ভাবের লালিত্যে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মধুরতায় প্রাণ পূরিয়া যাইবে। মূল্য আট আনা।

## রঙ্গনাট্য।

(১১) আলিবাবা—লক্ষ লক্ষ লোকে ইহার অভিনয় দেখিয়া-

ছেন ; কিন্তু বাঁদী মরজিনার হাবভাব নৃত্যের মধ্যে তাহার গাম্ভীর্য্য তেজস্বিতা ও ধর্ম্ম কয়জন লক্ষ্য করিয়াছেন ? মূল্য আট আনা।

(১২) বেদৌরা—সত্য কথা বলিতে হইলে, এরূপ হাস্য রসোদ্দীপক নাটক অতি অল্পই আছে। ইহার গান বড়ই মধুর। মূল্য, আট আনা।

## রূপক নাট্য।

(১৩) প্রমোদ রঞ্জন—রূপক নাট্য বলিলে, একটা দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার বুঝিবেন না। এমন সুকৌশলে গ্রন্থকার "শান্তি" ও "মুক্তি" দুইটী সখীকে প্রাণময়ী প্রতিমারূপে গড়িয়া "মানুষ" খুঁজিয়া উপহার দিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র দর্শক তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার এক একটী গান এক একটী কোহিনুর। গ্রামোফোণে হাজার হাজার রেকর্ড হইয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা।

## গীতিনাট্য।

(১৪) বৃন্দাবন-বিলাস—বৈষ্ণব কবিগণের রত্ন সংগ্রহ করিয়া একটী মালিকা রচনা করা হইয়াছে। গানগুলি সাজাইবার কৌশলে ইহা একখানি সুখপাঠ্য নাটক। মূল্য, ছয় আনা।

(১৫) বরুণা—ইদানীং এরূপ সরস নাটক দেখিতে পাওয়া দুর্ল্লভ। সহস্র সহস্র লোক ইহার অভিনয় দেখিয়া, ইহার অলৌকিক গল্পচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, ইহাকে গীতিনাট্যের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মূল্য, আট আনা।

## প্রহসন।

(১৬) দাদা ও দিদি—প্রহসন শুনিলেই লোক বিশেষের কুৎসা মনে করিবেন না। তবে যিনি চারি আনা অপব্যয় করিতে সাহস করেন, তিনি 'চন্দ্রদ্বীপ' হইতে 'হট্টমালা'র দেশে সুস্বাগত এই 'দাদা' ও 'দিদিকে' দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য, চারি আনা।

## নক্সা।

(১৭) বাসন্তী—হাস্যরসের আধার, বাসন্তী শোভার মেলা, দুঃখে শান্তি—বাসন্তী। মূল্য, চারি আনা।

(১৮) ভূতের বেগার—এতকাল চাকরী করিয়া আমরা কেবল ভূতের বেগার দিতেছি; এবং বংশধরদিগের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মৃত্যুকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছি। তবে কি আমাদিগকে এ বিষম চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করিতে কেহ নাই? মুক্তিদায়িনী আমাদিগের অপেক্ষা করিতেছেন। শুধু ভক্তিসহকারে, আমাদিগের তাঁর শরণ লইবার প্রয়োজন। গ্রন্থকার নিজে লইয়া আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। মূল্য চারি আনা।

## নাট্যকাব্য।

(১৯) রঘুবীর—প্রবল অত্যাচারীর উৎপীড়নে, ধীর প্রকৃতি সাধু পরিণামে কিরূপে দস্যু হইয়াছিল, তাহার একটী উজ্জ্বল প্রাণময় চিত্র। ভাবুক যুবকের সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টব্য। শুধু তাই নয়, অভিনীত করিয়া

অপরকে দেখানও কর্ত্তব্য। শ্রবণ বিমোহন ছন্দ—স্বর্গীয় ভাবস্রোত, চরিত্রাঙ্কণে অসাধারণ কৌশল। মূল্য, বারো আনা।

(২০) অশোক—জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আমাদেরই ঘরের রাজর্ষি মহারাজ অশোকের চরিত্রাবলম্বনে। আলেক্‌জাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ন, অল্প শিক্ষিতের কাছেও পরিচিত; অথচ মহারাজ অশোক আমাদের হারাইয়া শোকার্ত্ত। এ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। যাঁহার অভিরুচি হইবে। মূল্য, একটাকা।

## উপন্যাস।

(২১) নারায়ণী -সিপাহী বিদ্রোহকালীন ছোটনাগপুরের একটি ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহাই যথার্থ গ্রন্থকারের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এরূপ লোমহর্ষণ উপন্যাস পাঠ করিতে ইতস্ততঃ করিলে, হে উপন্যাস পাঠক! আপনার পাঠ করা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। ইংরাজী, বাঙ্গালা সহস্র পুস্তক সত্ত্বেও আপনার পাঠাগারের অভাব মোচন হইবে না। বঙ্গের সুপুত্র স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, এক প্রকাশ্য সভায় কোন এক বক্তৃতা উপলক্ষে কথায় কথায় এই নারায়ণী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"আমি এক বিলাতী শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের এক নূতন উপন্যাস পাঠ করিয়াছি। আর ক্ষীরোদ বাবুর নারায়ণীও পড়িয়াছি। নারায়ণী অগ্রে বাহির না হইলে, ক্ষীরোদ বাবু তাঁহার পুস্তক দেখিয়া নিজের পুস্তক লিখিয়াছেন—এই কথা সমালোচকমণ্ডলীর মধ্যে সাব্যস্ত হইত। ক্ষীরোদ বাবুর সৌভাগ্য তিনি অগ্রেই তাঁহার নারায়ণী লিখিয়াছেন। উভয় উপন্যাসে এরূপ

অপূর্ব্ব মিল আর কথন দেখা যায় নাই।" অথচ ইংরাজ লেখকের উপন্যাস এতদিনে লক্ষাধিক বিক্রীত হইয়া থাকিবে; কিন্তু বাঙ্গালার প্রতিভাবান লেখকের ভাগ্যে আজিও পর্য্যন্ত নারায়ণীর প্রথম সংস্করণ শেষ হয় নাই!! অথচ উৎকৃষ্ট বাঁধাই, প্রায় চারিশত পৃষ্ঠা—কিন্তু মূল্য, দেড় টাকা।

নারায়ণী সম্বন্ধে আমরা আর একটা আশ্চর্য্য বিষয় বলিব। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে সাঁওতাল পরগণার জনৈক রাজার সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গবাসী তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"নারায়ণীর কাহিনীর সঙ্গে এই ঘটনার বিস্ময়কর সামঞ্জস্য! নারায়ণী আগে লেখা না হইলে, আমরা মনে করিতাম, ক্ষীরোদ বাবু এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই উপন্যাস লিখিয়াছেন।"

এ অপূর্ব্ব উপন্যাস দেখিবার ও প্রিয়জনকে দেখাইবার জন্য আপনার সাধ হয়না কি?

প্রকাশক—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।